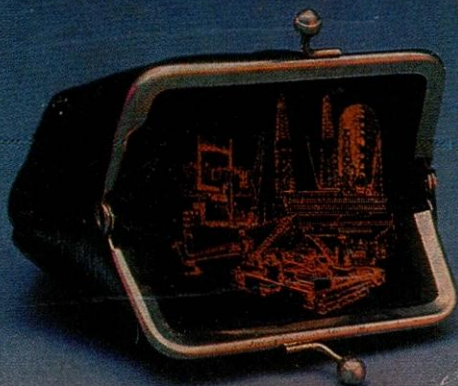


সাম্প্রতিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-কথ

আ. বুজুয়েভ

পাঁজিতন্ত্র র কা





সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ

আ. বুজুয়েড

পুঁজিতন্ত্র কী

6 September 2005



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভলকভ
(প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক),
ফ. বুল্গাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন,
ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউলভ

АВС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

А. Бузуев

ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛИЗМ?

На языке бенгали

ABC OF SOCIAL AND POLITICAL KNOWLEDGE

A. Buzuev

WHAT IS CAPITALISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1987

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{0603010100-476}{014(01)-88}$ 303—88

ISBN-5-01-000812-2

সূচি

মুখবন্ধ	৭
প্রথম অধ্যায়। পুঞ্জিতন্ত্রের সংস্থিতি ও সারবস্তু . . .	১০
১। মার্কসের 'পুঞ্জি'	১১
২। পুঞ্জিতন্ত্রের জন্ম	১৫
৩। পুঞ্জির আদি-সংগঠন	২০
৪। সরল ও পুঞ্জিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন . . .	২৩
৫। পণ্য ও পণ্যের ধর্ম	২৬
৬। পণ্যমূল্যের পরিমাণ	৩০
৭। অর্থের সারবস্তু ও অর্থের ক্রিয়াকলাপ . . .	৩১
৮। অর্থের পুঞ্জিতে রূপান্তর	৩৩
৯। পণ্য হিসাবে শ্রমশক্তি	৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়। শ্রমিকের রক্তচোষা এক বাদুড় . . .	৩৯
১। পুঞ্জিতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম . . .	৩৯
২। পুঞ্জি ও পুঞ্জির খণ্ডাংশ	৪৩
৩। মেহনতিদের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির দুইটি পথ . . .	৪৭

৪। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে মজদুরি	৫২
৫। নামিক ও প্রকৃত মজদুরি	৫৮

তৃতীয় অধ্যায়। শোষক গোষ্ঠীর ‘পবিত্র জোট’	৬২
১। গড় মদুনাফা ও উৎপাদনের দাম	৬৩
২। বাণিজ্যিক পুঁজি ও বাণিজ্যিক মদুনাফা	৬৭
৩। ঋণের পুঁজি ও সুদ	৭২
৪। পুঁজিতান্ত্রিক জমির খাজনা	৭৭

চতুর্থ অধ্যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ	৮৫
১। পুঁজি সঞ্চয়ন ও বেকারবাহিনী গঠন	৯৪
২। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম	১০১
৩। শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম	১০৭

পঞ্চম অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদ: অর্থনীতি ও রাজনীতি	১১৭
১। সাম্রাজ্যবাদ কী?	১১৭
২। উৎপাদন ঘনীভবন ও একচেটিয়া গোষ্ঠী	১১৯
৩। ফিনান্স পুঁজি ও ধনকুবেরতন্ত্র	১২৩
৪। পুঁজি রপ্তানি	১২৬
৫। বিশ্বের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজন	১২৮
৬। অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ	১৩৩
৭। সাম্রাজ্যবাদ: পরজীবী, ক্ষীয়মাণ পুঁজিতন্ত্র	১৩৬
৮। সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি	১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়। ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন: একচেটিয়া অষ্টোপাস	১৫৫
১। বিশ্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যগর্ভিত	১৫৫
২। দেশের চেয়ে বিদেশ আরও ভালো কেন?	১৫৯
৩। টি এন সি-র বৈদেশিক সম্প্রসারণের অর্থনৈতিক ফলাফল	১৬১
৪। ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন: বিপদ না প্রতিশ্রুতি?	১৬৫

সপ্তম অধ্যায়। একচেটিয়া ও বর্জ্যেয়া রাষ্ট্রের জোট . . .	১৭৪
১। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র: উৎপত্তি ও মর্মবস্তু	১৭৫
২। বর্জ্যেয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা	১৮১
৩। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ	১৮৬
৪। জাতীয় আয় পুনর্বণ্টন	১৮৯

অষ্টম অধ্যায়। মৃত্যু-ব্যবসায়ী ও সেনানীরগ: একটি অশুভ জোট	১৯৩
১। সামরিক-শিল্প সমাহার	১৯৫
২। অস্ত্রব্যবসা	১৯৮
৩। সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ	২০৪
৪। সামরিকীকরণের ফলাফল	২০৬

নবম অধ্যায়। নয়া-উপনিবেশবাদ	২১২
১। উপনিবেশিক ব্যবস্থা: সংকট, ভাঙন ও পতন	২১৩
২। নয়া-উপনিবেশবাদের মর্মবস্তু	২১৬
৩। 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ'	২১৮
৪। 'সাহায্যের' ছদ্মবেশে	২২৩
৫। নয়া-উপনিবেশবাদ ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতা	২২৭
৬। কোন পথ বেছে নেব?	২৩০

দশম অধ্যায়। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট	২৩৩
১। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট: উদ্ভব ও মূখ্য পর্যায়সমূহ	২৩৪
২। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের পর্যায়সমূহ	২৩৬
৩। বর্ধমান অর্থনৈতিক অসঙ্গতি	২৪২
৪। আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২৪৩

একাদশ অধ্যায়। আজকের পুঞ্জিতশ্বের রাজনৈতিক ও

আর্থিক সংকট	২৫০
১। রাজনীতির সংকট	২৫১
২। সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শের সংকট	২৫৪
৩। নৈতিকতা ও আইনের সংকট	২৬১
টীকা ও ব্যাখ্যা	২৬৮

মুখবন্ধ

উজ্জ্বল নিওন আলো, চোখ-ধাঁধান প্রদর্শগবাক্ষ, পণ্যবোঝাই বিপণী, 'সমান সুযোগ-সুবিধার' মিষ্টি বদলির আড়ালে পুঁজিতন্ত্রের সত্যিকার প্রতারক চেহারাটি আত্মগোপন করে এবং তাতে বর্জ্যোয়া দুনিয়ার বাস্তবতার বহু প্রশ্নের মূল্যায়ন কঠিনতর হয়ে ওঠে।

অসাম্য, বৈষম্য, সামাজিক অবিচার, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুনিয়ায় যুদ্ধাশঙ্কার জন্য দায়ী কে? সবগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সামাজিক কাঠামো এত অসম এবং শ্রেণীগত অসঙ্গতি এত তীব্র ও আপসহীন কেন?

কেন মর্দুটিমের বিস্তৃশালী বিলাসে নির্মিঞ্জিত আর পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ন্যূনতম নিত্যপ্রয়োজনীয়ের জন্য হররোজ কঠোর

মরণপণ লড়াই করতে বাধ্য হয়? কেন কিছু লোকের ভাগ্যে কেবলই সুখভোগ, তাদের ব্যক্তিগত শিল্পসংগ্রহ জাদুঘরকে লজ্জা দেয়? কেন তাদের শিকারের জন্য থাকে শত শত একরের নিজস্ব শিকার ভূমি, আর একমুঠো ভিক্ষানের জন্য অন্যদের দাঁড়াতে হয় দীর্ঘ লাইনে, কস্বলের বদলে সংবাদপত্র নিয়ে শতে হয় খোলা ফুটপাথে? কেনই-বা আলো, নদমা বা বহুতা জলের ব্যবস্থাহীন নোংরা বস্তির অদূরে থাকে বিশাল প্রাসাদ? পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার অনেকের ভাগ্যে কেন নেই শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ? কেন লক্ষ লক্ষ সমর্থ নরনারী বেকার বা অর্ধ-বেকার আর অস্বপ্রতিযোগিতায় অপব্যয়িত হচ্ছে বিপুল অর্থ যার একাংশই সকল অভাবী মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আবাসনের জন্য যথেষ্ট হত?

পুঁজিতন্ত্রের এইসব অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি থেকেই তার তীব্রতম ও সদা-অবনতিশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব। এগুলি: ব্যাপক বেকারি, মদ্রাস্রাণীতি, অপরাধ বৃদ্ধি, পৌনঃপুনিক অর্থনৈতিক বিকার, প্রলয়ঙ্কর সংকট ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের বর্ধমান আশঙ্কা। বর্তমানে কেউই পুঁজিতন্ত্রের জন্য কোন সুদিনের পূর্বাভাস দেয়ার ঝুঁকি নেয় না, কেননা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষমতাসীন যেকোন সরকার ও পার্লামেন্টে যেকোন বদজোয়া পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বিশেষে কারও পক্ষেই এই 'রুগ্ণ' সমাজের রোগমোচন সম্ভব নয়।

পুঁজিতন্ত্র সর্বদাই রোগগ্রস্ত ছিল না। যৌবনে,

সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতালাভের পর প্রাণশক্তি ও সৃজনশীল সামর্থ্যে ভরপূর পুঁজিতন্ত্র যেন মানবজাতির জন্য মৃদু ও প্রাচুর্য আনবে এমনটিই মনে হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই এইসব অলীক কল্পনা উবে যায় এবং পুঁজিতন্ত্র তার প্রগতিশীল আরোহণে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর পর মানবজাতির প্রগতির পক্ষে বর্ধমান বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্ষয়গ্রস্ত মরণাপন্ন ও নিজের বিনাশের দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবমান একটি সমাজ হয়ে ওঠে।

আজ বহু জাতি একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ছে এবং অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ বেছে নিয়েছে। একই সময় পুঁজিতন্ত্র আজও পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কোটি কোটি মানুষকে দৃষ্টি-দুর্দশার জর্জরিত করছে। পুঁজিতন্ত্র কী এবং বিপুল পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির পরও কেন তা সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধ হয়ে আছে এই সত্য সকল কর্মী মানুষেরই আজ জানা উচিত।

পুঁজিতন্ত্র কী? কীভাবে ও কখন এর উদ্ভব ঘটেছিল? কোন্ পথে আজ পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে? মেহনতি মানুষ, সারা মানবজাতির জন্য তার গর্ভে কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে? পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কী? এগুলিই বইটির আলোচ্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

পূর্জিতনের সংস্থিতি ও সারবস্তু

মানবজাতি তার ঐতিহাসিক বিকাশে বন্যপ্রাণী শিকারে তীর ও বর্শা ব্যবহারের সেই আদিম সমাজ থেকে আজকের কৃত্রিম উপগ্রহ, রোবট ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের এই যুগ পর্যন্ত এক দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ-চিন্তায় মানুষ সর্বদাই আবিষ্ট থেকেছে। ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হতে পারে কিনা তা নিয়েও সে ভাবনা-চিন্তা করেছে। মানবজাতি শৈশবে নভোমন্ডলে নক্ষত্র ও গ্রহাদির অবস্থান থেকে ও অন্যান্য অনুরূপ সাদাসিধা পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ অনুমানের প্রয়াস পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এগুন্নি ততটা নির্ভরশীল ছিল না।

পরবর্তীকালে মানুষ জেনেছে যে মানবসমাজ নির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় বিকশিত হয় আর

এইসব নিয়ম সম্পর্কিত জ্ঞানই তাকে অতীতকে শুদ্ধভাবে বদ্বতে, বর্তমানের মূল্যায়ন করতে এবং ভবিষ্যতও কিছুটা আঁচ করতে সাহায্য যোগায়। শ্রেষ্ঠতম মনীষীরা এই নিয়মগুলির মর্মমূলে পৌঁছতে চেয়েছেন, অনেক দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক ও ধর্মগুরু ইতিহাসের গতিপথ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। গত কয়েক শতাব্দী তাঁদের কেউ কেউ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে মানবসভ্যতার পূর্ণপরিণতি ও বিকাশের শীর্ষবিন্দু ভেবেছেন। অন্যরা ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের কঠোর সমালোচক ও তার অনিবার্য পতনের ভবিষ্যদ্বক্তা। কিন্তু এঁদের কেউই নির্দিষ্ট কোন মতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করতে পারেন নি। জার্মান মহামনীষী ও বিপ্লবী কার্ল মার্কস (১৮১৮—১৮৮৩) সর্বপ্রথম পুঁজিতন্ত্র কী — এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ ও নিগূঢ় বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়েছিলেন।

১। মার্কসের ‘পুঁজি’

মার্কস পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ নিরীক্ষায় তাঁর সাবালক জীবনের পুরোটাই ব্যয় করেন। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক মতামত নিজের মূল গ্রন্থ ‘পুঁজি’তে উপস্থাপিত করেন। উল্লেখ্য, ‘পুঁজি’ রচনায় লেগেছিল চল্লিশ বছর।

‘পুঁজি’ রচনা একটি সত্যিকার বৈজ্ঞানিক বীররত্ন, কেননা মার্কস এক দুঃসহ পরিস্থিতিতে কাজটি সম্পূর্ণ করেন। সেইসব দিনে তিনি ও তাঁর পরিবার নিরন্তর

অভাবে থাকতেন, বাড়িভাড়া বাকি পড়ত, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কেনাকাটারও অর্থ জুটত না। জীবনসায়াহে এক চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন যে ‘পুঞ্জি’ রচনার জন্য তাঁকে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু এজন্য তাঁর কোন মর্মপীড়া ছিল না: ‘জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন তথাকথিত ‘বাস্তববাদী’ লোকদের আমি উপহাস করি। কেউ ষাড় হতে চাইলে অবশ্যই মানুষের দুঃখকষ্টের দিকে তার তাকান চলে না, দেখতে হয় নিজের স্বার্থটুকুই। কিন্তু আমি যদি বইটি শেষ না করে, অন্তত পান্ডুলিপিটি তৈরি না করেই মারা যেতাম তাহলে নিজেকে যথার্থই ‘অবাস্তববাদী’ ভাবতাম।’*

দুর্ভাগ্য, মার্কস জীবদ্দশায় ‘পুঞ্জি’র সবগুলি খণ্ড সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। মার্কসের অকৃগ্রিম বান্ধব, সহকর্মী ও সহযোদ্ধা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০—১৮৯৫) প্রাণপাত প্রয়াসে ওই খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ করে বিশ্বজনকে উপহার দেন।

সমাজবিজ্ঞানে মার্কস এক বিপ্লবপ্রসূতা। পুঞ্জিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শ, আইন ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর গভীর নিরীক্ষা পুঞ্জিতন্ত্রকে একটি জীবন্ত সামাজিক সত্তা হিসাবে যাবতীয় বৈচিত্র্য সহ — তার জন্ম, বিকাশ ও পরিশেষে

* ‘Marx to Siegfried Meyer in New York, April 30, 1867’, Marx/Engels, *Selected Correspondence*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 173.

আপন অসঙ্গতির চাপে তার অবলম্বিত নিয়তি —
তাকে উপস্থাপিত করেছিল।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণে মার্কস একটি নতুন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পদ্ধতিটি তিনি
বিশদ করেছিলেন এঙ্গেলসের সঙ্গে এবং তা দ্বন্দ্বমূলক
ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মানবসমাজ যে
সরল থেকে উচ্চতর রূপে উদ্ভবগামী সর্পিণ পথে
বিবর্তিত হয়ে চলে এবং এই পথের প্রতিটি বাঁক
একটি উচ্চতর স্তরে পৌঁছয় — পূর্বোক্ত পদ্ধতি তা
প্রমাণের সহায়ক হয়েছিল।

এই নতুন পদ্ধতির সারমর্ম হল এই সত্যের
স্বীকৃতি: মানুষ নিজেই আপন ইতিহাস সৃষ্টি করে
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের মাধ্যমে, তাতে উৎপাদনে
তাদের শ্রমের কার্যকলাপই পরিশেষে তাদের জীবনে
চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

বৈষয়িক পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও
ভোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যকার নির্দিষ্ট সম্পর্ক
(উৎপাদন সম্পর্ক) মানবজাতির বিকাশের প্রতিটি
মুখ্য পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিশীল, থাকে। এইসব
সম্পর্কের ভিত্তি উৎপাদনের উপায়ের (উপকরণ,
হাতিয়ার, শ্রমসামগ্রী) উন্নতির স্তর দ্বারা, যথার্থ
উৎপাদকের — মেহনতির (উৎপাদনী শক্তি) গুণাগুণ
দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন
সম্পর্ক একযোগে গড়ে তোলে উৎপাদন প্রণালী,
অর্থাৎ মানুষের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক
পণ্যদ্রব্য সৃষ্টি ও আত্মসাতের ঐতিহাসিকভাবে

শর্তাধীন প্রণালী। উৎপাদন প্রণালী দ্বারাই সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদটি গঠিত এবং তার উপরই দাঁড়ায় উপরিকাঠামো আর এই শেষোক্তটি হল ধ্যানধারণা সহ আনুষ্ঠানিক সংস্থাগুলি — রাষ্ট্র, রাজনৈতিক পার্টিগুলি, আদালত, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির নির্ধারক।

উপরিকাঠামো সহ উৎপাদন প্রণালী নিয়েই গঠিত হয় সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থার (গঠনরূপ)।

ইতিহাসের ধারায় পাঁচটি সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থার বিদ্যমান: আদিম সম্প্রদায়গত, দাসপ্রথাধীন, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট (তার প্রথম পর্যায় — সমাজতন্ত্র)। এই সংস্থার গুলি মানদ্বয়ের ইচ্ছা বা চেতনা নিরপেক্ষ, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের তাড়নায় একটি বিষয়গত প্রক্রিয়ায় পর্যায়িকভাবে একে অন্যের স্থানাপন্ন হয়। উৎপাদনী শক্তি যখনই উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত হয়, শেষোক্ত প্রথমোক্তকে শঙ্খলিত করে তখনই একটি সংস্থার পরবর্তীটিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঠিক এটাই পুঁজিতন্ত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্রের উপর বুদ্ধিজীবী বিপ্লব চরম আঘাত হেনেছিল হল্যান্ডে ১৬শ শতকের শেষে, ইংলন্ডে ১৭শ শতকে ও ফ্রান্সে ১৮শ শতকে আর সেগুলি ওইসব দেশে বুদ্ধিজীবীর বিজয় ঘোষণা করেছিল। অতঃপর পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মানি, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে।

মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থার হিসাবে পুঁজিতন্ত্রের যে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে তাতে লেখকের বিস্ময়কর চিন্তাশক্তি ও বিপদল,

বিশ্বকোষকল্প জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এই সর্বকিছুর জন্য উক্ত দুর্দান্ত গ্রন্থটি কখনই নিরস মনে হয় না, তা লিখিত সাবলীল শৈলীতে, ফলত বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য।

মার্কসের ‘পুঁজি’ যে-সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও মূল ভিত্তি বিশ্লেষণ করেছে এখনো সকল পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সেগুণের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এককভাবে এর মাধ্যমেই ষাবতীয় নতুন বৈশিষ্ট্য সহ আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব।

২। পুঁজিতন্ত্রের জন্ম

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ভে অঙ্কুরিত হওয়ার পর পুঁজিতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরই বেড়ে উঠেছিল। বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় পুঁজিতন্ত্র সামন্ততন্ত্রকে ভেতর থেকে বিনষ্ট করছিল এবং নতুন, পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের ভূমি প্রস্তুত করছিল। সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে পুঁজিতন্ত্রের উপাদানগুলির প্রথম উন্মেষিত হওয়ার ঘটনা মোটেই কোন আপাতিক ব্যাপার নয়, কেননা সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র তো সগোত্রীয় — দুটি ব্যবস্থাই উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণভিত্তিক।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ মূলত সামন্ততান্ত্রিক জমিদারির ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল যেখানে প্রায় সমস্ত উৎপন্ন বস্তু সরাসরি পরিভুক্ত হত। সামন্তপ্রভুর ব্যক্তিগতভাবে অধীন

ভূমিদাসরা বিভিন্ন কর্তব্য পূরণ করত। প্রখ্যাত রত্ন কার্ণব নিকোলাই নেন্সভ তাঁর একটি কবিতায় এগুর্নীর অপূর্ব চিত্রকল্প বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাতে সাভ্কা নামে ভূমিদাস ছিল সকল কাজের কাজী: সোমবারে গম ভাঙা, মঙ্গলবারে অশ্বাদি পশুর সাজনির্মাতা, বৃধ ও বৃহস্পতি বারে প্রভুর প্রশস্ত হলগুর্নিলে টুকিটাকি নানা কাজ আর সপ্তাহের বাকি দিনগুর্নিলে রুটি স্কেকা, লাকড়ি কাটা, অন্যান্য অজস্র জরুরি কাজকর্ম করা। তথাপি সাভ্কা ও তার বংশধররা এমন বিস্ময়কর বহুবিধ দক্ষতা সত্ত্বেও সমাজের বর্ধমান আধুনিক চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে অচিরেই ব্যর্থ হয়, যে-চাহিদাগুর্নীর দরুন প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তদনুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে হ্রস্ববিকাশ ঘটেছিল কারুশিল্পের, নগরের, ব্যবসা ও আর্থিক কার্যকলাপের, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের যাবতীয় চাহিদার, যা ভোগসর্বস্ব (প্রাকৃত) সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতটিকে হ্রস্বগত নিচ থেকে ধসিয়ে দিচ্ছিল।

ভোগসর্বস্ব অর্থনীতি ধীরে ধীরে বাজারে বিক্রয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকে, অর্থাৎ পরস্পরের তীর প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদকদের পণ্যোৎপাদনকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল, যার ফলে কেউ কেউ ধ্বংস হচ্ছিল, কেউ কেউ ধনী হয়ে উঠছিল, আর পণ্যোৎপাদকদের স্তরায়ন ঘটিছিল ধনী ও দরিদ্রে।

বাণিকের (বাণিজ্যিক) পুঁজি ছিল সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ ধসানোর একটি কার্যকর হেতু এবং তা পণ্য-

অর্থ সম্পর্কের বলয় বিস্তারের জন্যই কেবল নয়। প্রথমে বণিকরা পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের শৃঙ্খল মধ্যগ হিসাবেই কাজ করত। কিন্তু কালক্রমে তারা কারিগরদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য কিনতে ও তাদের কাঁচামাল ও নগদ ঋণ যোগাতে শুরুর করে। কিছুকালের মধ্যেই কারিগরদের অনেকেই বণিকদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে এবং অতঃপর বণিকের পুঁজি কর্তৃক একদা-স্বাধীন কারিগরদের একটি ব্যারাকে তাড়িয়ে নেওয়ার দিন আসন্ন হয়ে ওঠে, যেখানে তারা নিজের জন্য কাজের বদলে কর্মশালার মালিকের জন্য কাজ করত। এভাবে বণিক কিছু সংখ্যক বিত্তবান কারিগরের সঙ্গে একযোগে মালিক হিসাবে শিল্পোদ্যোগ গড়তে শুরুর করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ও একটি বিশ্ববাজার গঠনের অনুপ্রেরণা এসেছিল বৃহৎ ভৌগোলিক আবিষ্কার থেকে: কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ইউরোপ থেকে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে ভাস্কো ডা গামার পৌঁছনো (মধ্য-১৫শ ও মধ্য-১৭শ শতক)। ফলত তৈরী পণ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন কারিগরসঙ্ঘের পক্ষে মেটান সম্ভবপর ছিল না, যাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ছিল গৎ-বাঁধা ও কার্যিক শ্রমভিত্তিক।

সামন্তান্ত্রিক সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সমাজের অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধ হয়ে উঠছিল এবং সেজন্য নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থিতি দ্বারা সামন্ততন্ত্রের প্রতিস্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

মানবজাতির বিকাশে পুঁজিতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্রের উপর একটি মূখ্য অগ্রপদক্ষেপ, কেননা পুঁজিতন্ত্র উৎপাদনী শক্তিকে সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদনের দ্রুত বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেছিল। যৌবনে পুঁজিতন্ত্রকে জাদুকর মনে হত, যে তার অনেকগুলি সুদৃশ্যিত রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিল। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি, জন্মের এক শতকেরও কম সময়ে মানবজাতির বিকাশে পূর্বতন সকল প্রজন্মের সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক শ্রেষ্ঠতর উৎপাদনী শক্তি সে সৃষ্টি করেছিল। মানবসমাজের গভীর সুপ্ত সম্পদের যে-আভাসটুকুও পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, তাই এখন বাস্তবায়িত হল যন্ত্রনির্মাণ, কৃষিক্ষেত্রে মার্কসই শ্রমের দ্বিবিধ ধর্মের প্রথম আবিষ্কারক এবং চালিত জাহাজ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফে।

পূর্বনো, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে বুদ্ধিজীয়া অক্লান্তভাবে ধ্বংস করে চলেছিল, নিদয়ভাবে ছিঁড়ে ফেলেছিল সামন্তপ্রভুর সঙ্গে সাধারণ মানুষকে আটক রাখার সকল বাঁধন, রাখল না শুদ্ধ নগদ অর্থস্বার্থ ছাড়া মানুষের মধ্যকার অন্যতর কোন বাঁধনকে।

আপন পতাকায় ‘স্বাধীনতা’, ‘সাম্য’ ও ‘ভ্রাতৃত্বের’ স্লোগান লিখে বুদ্ধিজীয়া ক্ষমতা দখল করেছিল। সে এই ওজরে পদমর্যাদার পার্থক্য তুলে দিয়েছিল যে সকল মানুষ সমান এবং নিজেকে অন্যের উপর বসানোর অধিকার কারও নেই। কিন্তু অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই ‘সাম্য’ একটি বুলি মাত্র, আর

‘স্বাধীনতা’ ও ‘দ্রাঘত্ব’ সম্পর্কেই অকেজো, কেননা অব্যাহত ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের বিদ্যমানতায় কেবল শোষণের রূপেরই পরিবর্তন ঘটেছিল: প্রাক্তন কৃষক-ভূমিদাস এখন হল মজদুর-দাস। বর্জোয়া একদা অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত প্রতিটি কর্মকাণ্ড থেকে মহিমার আভাটুকু খসিয়ে দিয়েছিল এবং চিকিৎসক, যাজক, কবি ও পণ্ডিতাদের তার ভাড়াটে-কর্মীতে পর্ববসিত করেছিল, যাঁরা মজদুরের জন্য কাজ করতেন। এমনকি পারিবারিক সম্পর্কও অর্থভিত্তিক লেনদেনের মরিচায় ঢাকা পড়েছিল।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে পুঁজিতন্ত্র কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছিল এবং এগুলির প্রথমটি — সরল সমবায়। এটা আসলে ছিল আগে পরস্পর থেকে আলাদাভাবে কাজ করত এই ধরনের কিছু সংখ্যক মজদুর-শ্রমিককে আগেকার ওই কাজই করার জন্য শ্রমপ্রক্রিয়ায় একত্রীকরণ। কিন্তু তাতে ইতিমধ্যেই তাদের শ্রমফলের উন্নতি ঘটেছিল। অর্চিরেই তা পথ ছেড়ে দিল ম্যানুফ্যাকচারিংকে। এটা ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের একটি উচ্চতর পর্যায়, তাতে একটি পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগ একইভাবে কায়িক শ্রমের ভিত্তিতেই চলত, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রমিক একটি জিনিস পুরোপুরি তৈরি করার বদলে এক বা একাধিক কর্মপ্রণালীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠত। এই ধরনের উৎপাদন কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং তাতেই যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল, উৎপাদনে এসেছিল হরেক রকমের হাতিয়ারপত্র।

যান্ত্রিক উৎপাদন হল পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের তৃতীয় পর্যায়। ম্যানুফাকচারিং থেকে এই পর্যায়ে উত্তরণই ‘শিল্পবিপ্লব’ বলে পরিচিত এবং তা প্রথম ঘটে ইংলণ্ডে (১৮শ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে ১৯শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ) ও পরে ছড়ায় অন্যান্য বহু দেশে। কার্যিক শ্রম থেকে যান্ত্রিক উৎপাদনে উত্তরণ ছিল সামন্ততন্ত্রের উপর পুঁজিতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়ের সূচক।

পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মেহনতিদের উপর নেমেছিল পাশব নির্যাতন এবং পুঁজির আদি-সঞ্জন নামে পরিচিত কালপর্বে তা বর্বরতম হয়ে উঠেছিল।

৩। পুঁজির আদি-সঞ্জন

পুঁজির আদি-সঞ্জন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার গতিপথে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা (কৃষক ও কারিগর) মজদুর-শ্রমিকে এবং উৎপাদনের উপায় ও অর্থসম্পদ পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি মেহনতিদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত জঘন্যতম ও বর্বরতম নির্যাতন, লুণ্ঠন, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ঔপনিবেশিক দখল ও দাস দ্বন্দ্ব-বিক্রয়ে সূচিহিত। মার্কস একটি আশ্চর্য উপমায় বলেছিলেন যে ‘নবজাত পুঁজি আসে আপাদমস্তক, প্রতিটি দেহরন্ধ্র রক্ত ও বর্জ্যে ভিজিয়ে।’*

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1984, p. 712.

পুঞ্জির আদি-সংগঠন প্রথম শুরুর হয় ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও ফ্রান্সে ১৬শ থেকে ১৮শ শতকে এবং ওখানেই সবিশেষ হিংস্র আকার ধারণ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইংল্যান্ডে কৃষকদের ক্ষেতজমিতে ‘বেষ্টনী আইন’ জারি করে ভেড়ার বাথান তৈরির ঘটনা উল্লেখ্য। কৃষকরা এতে জমিজমা হারায়, জীবিকার উপায় হারায়। ‘ভেড়া মানুষ খাচ্ছে’ — এটা ছিল সেকালের প্রচলিত প্রবচন।

বাউন্ডলে কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার ‘খুনে’ আইন জারি করে তাদের পুঞ্জিপতিদের কারখানায় তাড়িয়ে নেয় এবং বেগদন্ড ও মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে তাদের মজুরি-দাসত্বে অভ্যস্ত করে।

পুঞ্জিতন্ত্রের প্রথম দিকে কর্ম-দিবস ছিল অসম্ভব দীর্ঘ: মজুরি-শ্রমিকরা প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর নির্বিশেষে ১২—১৪ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় কঠোর শ্রমে নিযুক্ত থাকত। মার্কস ও এঙ্গেলস বিষয়টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের রচনায় মজুরি-শ্রমিকদের চরম দুর্দশার অজস্র তথ্য মেলে: নোংরা ব্যারাকে তাদের ঠেসে রাখা হত, প্রয়োজনের তুলনায় খাবার জুটত খুবই কম, শ্রমের জন্য পেত যৎসামান্য। গরীবদের সন্তানরা ছিল সবচেয়ে দুর্ভাগা। ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে শিশুরা (৭—১৪ বছর) কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হত, চরম নির্যাতন সহ্য করত: অকল্পনীয় পরিমাণ অতিরিক্ত পরিশ্রম করত, বেত খেত, কর্মস্থলে শিকলবন্দী থাকত। সহ্যসীমা

অতিদ্রাস্ত এইসব হাড্ডিসার শিশুদের অনেকেই
আত্মহত্যা করত।

উপনিবেশ ও সমুদ্রের অপর পারের দেশগুলির
নির্মম লুণ্ঠন রোম ধ্বংসকারী বর্বরদের লজ্জা দিত।
আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের ডালে-মূলে নিৰ্বংশ
করা হয়। যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী, বিশেষত সোনা
ও রূপা ইউরোপে জাহাজে চালান যায়। ইউরোপীয়
উনিবেশকারীদের লোভের পরিসীমা ছিল না এবং
তাতে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার বিলয় ঘটে।
আফ্রিকা কৃষ্ণাঙ্গ শিকারের ব্যক্তিগত বনভূমি হয়ে
ওঠে। এইসব মানুষকে আমেরিকার বাগিচা-মালিকদের
কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করা হত এবং তারা পশুর
চেয়েও খারাপ ব্যবহার পেত: নগণ্য বিচ্যুতি ঘটলেই
বেদ্রাঘাতে মরণাপন্ন হওয়া কিংবা যথার্থই খতম হয়ে
যাওয়া। তাদের সারা জীবনটাই কাটত দাস-প্রহরীদের
চাবুকের দ্বায়ে।

ইউরোপে পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের যুগে যে ধরনের
বর্বর ও পাশব আচরণ করা হত, আমাদের একালে
তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরবর্তী
কোন কোন উন্নয়নশীল দেশের মেহনতিদের উপর
স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে।

পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের অর্থ হল একইসঙ্গে একদিকে
মেহনতিদের ব্যাপকভাবে নিঃস্ব বানিয়ে তাদের ‘মুক্ত’
শ্রমশক্তিতে রূপান্তর এবং অন্যদিকে নগণ্য সংখ্যক
লোকের কাছে লুণ্ঠিত সম্পদ সঞ্চয় ও বিপুল বিভক্তকে
পুঁজিতে রূপান্তর।

পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল কার্যত পণ্য-অর্থনীতি দ্বারা কায়ক্ৰেশে জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতির সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের সামিল। পণ্যোৎপাদনের চরম প্রাধান্য পুঁজিতন্ত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সেজন্য সমাজব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিতন্ত্রের মর্মোদ্ভাবের যেকোন প্রয়াস তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মগুলির, অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের ব্যাখ্যা থেকেই শুরু করা উচিত। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বাড়ি, জমি ও কলকারখানা, খেতাব ও মর্যাদা, আরাম, বিবেক ও সম্মান, মানুষের দেহ ও আত্মা সহ সবই ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী।

তাহলে পণ্যোৎপাদন বলতে কী বোঝায়? এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৪। সরল ও পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন

নিজস্ব পরিভোগের বদলে ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময়ের জন্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকেই পণ্যোৎপাদন বলা হয়। বিক্রেতা তার নিজস্ব একটি শ্রমফল বাজারে আনে নিজের বিক্রয়ফল দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য।

হাজার হাজার বছর ধরে বিনিময়ের জন্য পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়ে আসছে। আদিম সম্প্রদায়গত সমাজ ভেঙে পড়ার সময়ই প্রথম এই ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং দাসপ্রথাধীন সমাজ ও সামন্ততন্ত্রের অধীনে অব্যাহত থাকে। তৎকালে অবশ্য পণ্যোৎপাদন ছিল একটি

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, কেননা তখনো কায়ক্রেশে
জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল, অর্থাৎ
সমাজ প্রধানত অভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিট সম্বায়ে
গঠিত ছিল, যাদের প্রত্যেকটি নিজ পরিভোগের জন্য
সবগুণি মূল সামগ্রী উৎপাদন করত। কেবল
পুঁজিতন্ত্রের অধীনেই পণ্যোৎপাদন একটি সর্বজনীন
ও প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ধরন হয়ে ওঠে।

দুটি মূল শর্ত আর্ত্তে আসার পরই পণ্যোৎপাদন
দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, শ্রমের সামাজিক বিভাজন
বিকাশের যথাযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত য় য়াতে ব্যক্তি
বা দল বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত হইছিল
(দৃষ্টান্ত হিসাবে, একদল ফসল ফলানো, অন্যদল
পশুপ্রজন, তৃতীয় দল হস্তশিল্পের সাহায্যে কাপড়,
পাদুকা ও সাজসরঞ্জাম তৈরিতে নিযুক্ত ছিল)।
দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার
ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মালিক হিসাবে উৎপাদকদের
অর্থনৈতিক পৃথকীকরণ হয়ে পড়েছিল। এইসব
পরিস্থিতিতে উৎপাদক ও ভোক্তারা কেবল বাজারেই
পরস্পরের যোগাযোগ রাখতে পারত, যেখানে তারা
ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদ বিনিময় করত।

উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক
পণ্যোৎপাদনের দুটি মূখ্য ধরন: সরল ও পুঁজিতান্ত্রিক
পণ্যোৎপাদন।

সরল পণ্যোৎপাদনের উৎস হল ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকদের
নিজ শ্রম, আর পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট রয়েছে মজুরি-শ্রমিকের শ্রমশোষণ। সরল

পণ্যোৎপাদন আর পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন মূলত অভিন্ন, কেননা উভয়েরই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা। সরল ও পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের দু'টিই প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ার আওতায় স্বতঃস্ফূর্ত ও এলোমেলো ভাবে বিকশিত হয়।

কিন্তু এই দুই ধরনের উৎপাদনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সরল পণ্যোৎপাদনে উৎপাদনের উপায়গুলি যথার্থ উৎপাদকেরই মালিকানাধীন থাকে, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনে সেগুলির মালিক থাকে পুঁজিপতিরা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পণ্যোৎপাদকের নিজস্ব ও পারিবারিক সদস্যদের শ্রম আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে শোষিত হয় মজুরি-শ্রম। প্রথমোক্তের মূল লক্ষ্য পণ্যোৎপাদকের নিজস্ব চাহিদা পূরণ ও শেষোক্তের ক্ষেত্রে পুঁজিপতির জন্য মুনামা অর্জন।

সরল ও পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের মধ্যকার সাদৃশ্য ও পার্থক্যের দরুন ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকদের — কৃষক, কারিগর ও হস্তশিল্পীর — স্বভাব দ্বিবিধ: একদিকে সে মেহনতি, অন্যদিকে সে মালিক। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় মালিক হিসাবে আপন ক্ষমতাবলে সে 'শেষ সীমায়' পৌঁছতে ও বিত্তশালী হতে চায় আর সেজন্যই অন্যের স্বার্থের বিনিময়ে মুনামা লাভে সে গররাজী নয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে মেহনতি হিসাবে তার অবস্থা মোটেই ঈর্ষনীয় নয়; কোন এক সময় বৃহৎ কৃষিসংস্থা বা শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিধবস্ত ও অপসৃত হওয়াই বেশির ভাগ ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকের অনিবার্ণ নিয়তি।

অনুকূল সামাজিক অবস্থায় সরল পণ্যোৎপাদন পদ্ধতিতান্ত্রিক উৎপাদনের সহায়ক হয়ে থাকে। এগুটির মধ্যে উল্লেখ্য: মর্দুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে উৎপাদনের উপায় ও বৃহৎ তহবিল কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমশক্তির পণ্যে রূপান্তর, অর্থাৎ শ্রমিকে রূপান্তর, যেসব শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু উৎপাদনের উপায় বণ্টিত এবং সেজন্য টিকে থাকার জন্য আপন কর্মশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য।

কিন্তু পণ্য কী তা বোঝা প্রয়োজন। মার্কসের মতে পণ্যের সারবস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে মজদুর-শ্রমিকের পদ্ধতিতান্ত্রিক শোষণের স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব এবং সেজন্যই তিনি 'পদ্ধতি' গ্রন্থে পদ্ধতিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়েই শুরুর করেছেন।

৫। পণ্য ও পণ্যের ধর্ম

পণ্য পদ্ধতিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের মূল একক। লেনিন বলেন যে পণ্যবিবিনিময় 'বুর্জোয়া (পণ্য) সমাজের সরলতম, তুচ্ছতম, মৌলিক, সামান্যতম ও প্রাত্যহিক সম্পর্ক, যে-সম্পর্কের মদুখোমুখি হতে হয় কোটি কোটি বার।'*

* V. I. Lenin, 'On the Question of Dialectics', *Collected Works*, Vol. 38, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 358.

পণ্য হল বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন একটি দ্রব্য। প্রতিটি পণ্যেরই দুটি ধর্ম থাকে : মানুষের কোন একটা চাহিদা পূরণ ও অন্যতর পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময়যোগ্যতা।

মানুষের কোন চাহিদা পূরণে পণ্যের সামর্থ্য তার ব্যবহার-মূল্য হিসাবে প্রকটিত হয়। একটি পণ্য মানুষের কোন ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করতে বা কোন জরুরি প্রয়োজন সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, খাদ্যে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য রুটি, মাখন বা মাংস; মানুষের বস্ত্রচাহিদা মেটানোর জন্য ফ্রক, কোট বা স্যুট; মানুষের জ্বালানির চাহিদা মেটানোর জন্য গ্যাস বা লাকড়ি, ইত্যাদি। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল আর অন্যান্য উৎপাদনের উপায় বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার-মূল্য ব্যতিরেকে কোন দ্রব্যের পক্ষে পণ্য হওয়া সম্ভব নয়, অন্যথা কেউই এর প্রয়োজন বোধ করবে না।

পণ্যের ব্যবহার-মূল্য প্রধানত বস্তুর স্বাভাবিক গুণ থেকেই উদ্ভূত এবং প্রত্যেকটি সমাজেই তা সম্পদের বৈষয়িক আধেয়। কিন্তু পণ্যোৎপাদনের আওতায় ব্যবহার-মূল্য বিনিময়-মূল্যের বাহন হয়ে ওঠে।

বিনিময়-মূল্য হল একটি পণ্যকে আরেকটি পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রিক অনুপাতে বিনিময়ের সামর্থ্য। বিনিময়কার্যে বিভিন্ন পণ্যের পারস্পরিক সমীকরণ এগুলির মধ্যে সাধারণ কিছু অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, যা পণ্যকে পরস্পরের সঙ্গে প্রমের করে তোলে। পণ্যের ব্যবহার-মূল্য গুণগতভাবে বিবিধ হওয়ার ও

সেগদুলি তাদের সাধারণ উপাদান শ্রমের সৃষ্টি বিধায় মনুষ্যশ্রমই সেগদুলির সাধারণ মানদণ্ড। পণ্যোৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম হল সেগদুলির মূল্যের ধারক এবং মূল্য হিসাবেই পণ্যগদুলি পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়।

যে-পণ্য উৎপাদনে যত বেশি শ্রম ব্যয়িত তার মূল্যও তত বেশি। কিন্তু একটি পণ্যে কতটা শ্রম ব্যয়িত হয়েছে খোদ পণ্যে তা মূল্যায়িত থাকে না, কেননা পণ্যের মূল্য কেবল বিনিময়কার্যে, বিনিময়-মূল্যের মাধ্যমেই প্রকটিত হয়। একটি পণ্যের জন্য অন্যটি বিনিময়ের প্রতিটি কাজ এইসব পণ্যে ব্যয়িত শ্রমের সমীকরণের সঙ্গে, অর্থাৎ মূল্য হিসাবে পণ্যের সমীকরণের সঙ্গে বিজড়িত।

সেজন্যই দেখা যায় যে পণ্য হল ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যের এক সমাহার এবং পণ্যের এই দ্বিবিধ ধর্ম পণ্যোৎপাদকের শ্রমের দ্বিবিধ ধর্ম দ্বারাই নির্ধারিত। মার্কসই শ্রমের দ্বিবিধ ধর্মের প্রথম আবিষ্কারক এবং এভাবে পণ্ডিতান্বিত শোষণের রহস্যটির উন্মোচক।

প্রতিটি পণ্যোৎপাদকের শ্রম একদিকে মূল্য শ্রম, অর্থাৎ কোন উদ্যোগ বা পেশার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিযুক্ত একটি মানুষের শ্রম হিসাবে নিজেকে মূল্য করে এবং সেভাবে একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। তাই ফিটার মিস্ত্রী হাতিয়ার গড়ে, রুটিপ্রস্তুতকারী রুটি সেঁকে, দার্জি স্যুট বানায়। হাজার হাজার সুনির্দিষ্ট ধরনের শ্রম আছে, তাদের সবগদুলিরই রয়েছে একটি সাধারণ কিছু, অর্থাৎ এগদুলির প্রত্যেকটিই হল মনুষ্যশক্তি, পেশীশক্তি, স্নায়ুচাপ ও

মস্তিষ্ক-চালনার খরচা, অর্থাৎ সাধারণভাবে মানদুষের শ্রমশক্তি খরচা ও সেভাবে এই প্রত্যেকটিই শ্রমকে প্রকটিত করে, যা বিমূর্ত। যে-রূপে পণ্যগুলি হাজার রকমের মূর্ত শ্রমের কোনটি দ্বারা আবৃত থাকে, বাজারে বিনিময়কার্যে সেই নির্দিষ্ট রূপ থেকে একটি বিমূর্তন ঘটে, পণ্যগুলি গুণগতভাবে অভিন্ন বিমূর্ত শ্রমের পিণ্ড বা কেলাস হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সমীকৃত হয়।

সরল পণ্যোৎপাদনের মতো পুঞ্জিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনেও পণ্যোৎপাদকের শ্রম হল সরাসর ব্যক্তিগত শ্রম, কেননা তা ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক। এইসঙ্গে এই শ্রম হল মোট সামাজিক শ্রমের একটি ক্ষুদ্রাংশও, কেননা তা নিষ্পন্ন হয় শ্রমের সামাজিক বিভাজনের আওতায়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যে, মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রমের মধ্যে একটি গভীর অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি রয়েছে এবং তা ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যের মধ্যকার অসঙ্গতিরই অভিব্যক্তি: পণ্যের লক্ষ্য পরিভোগ, কিন্তু তা উৎপন্ন হয় বিক্রয়ের জন্য। দৈনন্দিন জীবনে এই অসঙ্গতি এতে আত্মপ্রকাশ করে যে কোন একটি পণ্য মূল্য হিসাবে মূর্ত না হলে, অর্থাৎ বিক্রি না হলে ব্যবহার-মূল্য হিসাবে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছবে না, পরিভুক্ত হবে না। পুঞ্জিতন্ত্রের আওতায় এই অসঙ্গতিটি অতি-উৎপাদনের সংকটকালেই সবচেয়ে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৬। পণ্যমূল্যের পরিমাণ

পণ্যমূল্য শ্রমসৃষ্ট বিধায় এর পরিমাণ পণ্যদ্রব্য শ্রমের মাত্রা দ্বারাই পরিমাপ্য। শ্রম-সময় (ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ) শ্রমের স্বাভাবিক মাপকাঠি। কেবল বিভিন্ন পণ্যোৎপাদনেই নয়, এক ও অভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরিতেও উৎপাদকদের বিভিন্ন পরিমাণ সময় লাগতে পারে এবং তাদের হাতিয়ার, দক্ষতা, কৌশল ও অন্যান্য অনেক কিছুর উপরই তা নির্ভরশীল।

একজন শ্রমিক একটি পণ্যোৎপাদনে ষতটা সময় লাগায় তা হল নিজের শ্রম-সময়। কিন্তু পণ্যমূল্যের পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষের ব্যয়িত শ্রম-সময় — যাতে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটা সম্ভব — তদ্বারা নির্ধার্য নয়। মূল্য হল সামাজিক শ্রমের মূর্তরূপ এবং সেজন্য পণ্যমূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম বা সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়, যা হল গড়পড়তা অর্থাৎ উৎপাদনের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়পড়তা শ্রমের দক্ষতা ও তীব্রতা সহ একটি পণ্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের অভিব্যক্তি। সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় স্থির নয়: কৃৎকৌশলের বিকাশ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে নিম্নমুখী প্রবণতা সহ তা বদলায়। প্রক্রিয়াটি বিষয়গত এবং উৎপাদকের ইচ্ছা ও চেতনা নিরপেক্ষভাবে এগোয়।

তাই, পণ্যমূল্যের পরিসর পণ্যে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের পরিমাণ দ্বারা পরিমাপ্য, আর খোদ মূল্য হল

পণ্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের একটি অভিব্যক্তি, বাজারে একটি পণ্যের সঙ্গে অন্যটির বিনিময় ঘটে পণ্যের সামাজিক মূল্যের পরিসর অনুসারে এবং বিনিময়কার্যের অন্তর্নিহিত নীতি হল : সমান মূল্যের জন্য সমান মূল্য। এই তো পণ্যোৎপাদনের মূল নিয়মগুলির অন্যতম, মূল্যের নিয়মের, সারবস্তু।

স্মর্তব্য, পণ্যমূল্য মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির উপলব্ধিকে অস্বীকার করে এবং তা প্রকটিত হয় কেবল বাজারে পণ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমীকৃত হওয়ার সময়, অর্থের — যা নিজেই একটি পণ্য — মাধ্যমে পণ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমীকৃত হওয়ার সময়।

৭। অর্থের সারবস্তু ও অর্থের ক্রিয়াকলাপ

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অর্থ একটি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত। অর্থের ইতিহাস ধূসর অতীতের বহুদূর অবধি বিস্তৃত। বহু শতক পূর্বে, পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুদয়ের অনেককাল আগে অর্থের উদ্ভব ঘটলেও পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের আওতায় তার ভূমিকা বহুগুণিত হয়। বর্জোয়ার কাছে ‘মনুষ্যবিবেকের অবিমিশ্র যন্ত্রণা বিস্মরণে অর্থ হল অধিপতি ও ঈশ্বর, রক্ত ও অশ্রুর উপর চূড়ান্ত আধিপত্যকারী, অসীম ক্ষমতার জন্য সকলের পরম পূজ্যপাদ,’ — লিখেছেন এমিল জোলা তাঁর ‘অর্থ’ উপন্যাসে। অর্থের ‘সামাজিক কর্তব্য’, অর্থাৎ অর্থের ক্রিয়াকলাপ তার

যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত করে। অর্থ হল অন্যান্য সকল পণ্যের মূল্যের পরিমাপ এবং পণ্যমূল্যের অর্থগত অভিব্যক্তিই তার দাম। এগুণিলির দামের মাধ্যমেই আমরা পণ্যের দুনিয়াকে উপলব্ধি করি, যেভাবে আমরা মনে মনে পণ্য ও অর্থের সমীকরণ করে থাকি।

অর্থ হল পণ্য-সংবহনের মাধ্যম এবং এভাবেই অর্থ একটি বিনিময়কার্য থেকে অন্যটিতে এগিয়ে চলে, নিষ্পন্ন করে একটি অস্থায়ী কাজ, যাতে সম্ভব হয়েছে অর্থের অভ্যন্তরীণ বিনিময়ে কাগজী মদ্রাকে (নামিক, অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্ধারিত মূল্যে) নিরেট স্বর্ণমদ্রার স্থলবর্তী করা।

পঞ্জিতান্ত্রিক সমাজের সম্পদের সর্বজনীন প্রতিনিধি অর্থ হল মজদুরের উপায়, অর্থাৎ অর্থ সঞ্চিত হয়, দীর্ঘকাল জমা থাকে।

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় থেকে অর্থ উদ্ভূত হয় ও এগুণিলির সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়। পণ্যবিনিময়ে অর্থ সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসাবে, অর্থাৎ বিনিময়ে সাধারণ স্বীকৃত পণ্য হিসাবে কাজ করে, যাতে অন্য যেকোন পণ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়। ইতিহাসের ধারায় সোনা ও রূপা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ-পণ্যের ভূমিকাসীন হয়েছিল, কেননা এই ধাতুগুণিলির ক্ষুদ্র পরিমাণ ও ভরের মধ্যে যথেষ্ট মূল্য থাকে, এগুণিলি সহজবিভাজ্য, সঞ্চারের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য। সংক্ষেপে, স্বাভাবিক ধর্ম এগুণিলিকে একটি সর্বজনীন তুল্যমূল্যের গ্রন্থাকলাপ সম্পাদনের উপযোগিতা দেয়। অর্থের উদ্ভব ও বিকাশ একটি প্রবল শক্তির উচ্ছ্রয় ঘটিয়েছিল, যার অধিকার

ছিল সম্পদ ও শক্তির সামিল। অর্থ এক জাদুকর, যে পুঁজিতন্ত্রের আওতায় নিজেকে যেকোন বাঞ্ছিত ও লোভনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত করতে পারে।

কিন্তুতে কোন পণ্যক্রয়ের সময় অর্থ তখন পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং এই কাজটি ক্রেডিট, কর প্রদান ও অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে চেক ও প্রত্যর্থপত্র পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে বহুল ব্যবহৃত।

পণ্য-প্রত্যাবৃত্তির জগতে অর্থ হল ক্রয় ও পরিশোধের একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যম। মাঝেমধ্যে অর্থ তার 'জাতীয় পোশাকটি' খুলে ফেলে ও মূল্যবান ধাতুখণ্ডের রূপ হিসাবে আবির্ভূত হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অর্থ এতটা শক্তিশালী কেন? কেন তা অন্যান্য মানুষের উপর ক্ষমতার উৎসধর, কেন তা একজনকে অন্যদের শোষণ করতে দেয়? এই প্রশ্নাবলীর একটিই উত্তর: পুঁজিতন্ত্রের আওতায় অর্থ পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

৮। অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর

অর্থ হল সরল পণ্যোৎপাদন বিকাশের শেষফল আর একই সময় পুঁজির আবির্ভাবের আদিরূপ। খোদ অর্থ কিন্তু পুঁজি নয় এবং তা পূর্ববর্ণিত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই কেবল পুঁজি হতে পারে।

সরল পণ্যোৎপাদনের আওতায় পণ্য-সংবহন নিম্নোক্ত সূত্রে প্রকটিত: পণ্য — অর্থ — পণ্য (প—অ—প)।

অর্থ (অ) হল সংবহনের সেই ক্রিয়ায় মাধ্যম হিসাবে প্রয়োজনীয়, যার সাহায্যে পণ্যগুলি বিনিময় করা হয়। এখানে পণ্যবিনিময়ের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট: যেমন, একজন কৃষক কাপড় কেনার জন্য শস্য বিক্রি করে। এখানে অর্থ আরেকটি পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত, অর্থাৎ তা পুঁজি নয়।

পুঁজি হিসাবে অর্থ-প্রচলনের পরিশেষ হল খোদ অর্থ—পণ্য—অর্থ (অ—প—অ)। এখানে পুঁজিপতি অর্থ ব্যয় করে না, কেবল অগ্রিম দেয়। সে অর্থ দেয় তা ফেরত পাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যে।

পুঁজি হিসাবে অর্থ-প্রচলনের পরিশেষ হল খোদ অর্থ। ‘প্রতিভা’ উপন্যাসে থিয়োডর ড্রেইজার দেখিয়েছেন যে পুঁজিপতি সামারফিল্ড প্রতিদিন অর্জিত স্বর্ণ বা রৌপ্য মদ্রায় তুষ্ট হত না, আগামীকাল সে আরও বেশি চাইত, তার লোভের কোন পরিসীমা ছিল না।

অর্থ—পণ্য—অর্থ সূত্রানুসারে অর্থের মালিক প্রথম যে-পরিমাণ মদ্রা লগ্নি করেছিল শেষেও তা ফেরত পেলে অর্থ-প্রচলন অর্থহীন ও নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। কাজটি তখনই কেবল অর্থবহ হবে যখন সে লগ্নিকৃত অর্থের চেয়ে অধিক অর্থ পাবে। বস্তুত, পুঁজি হিসাবে অর্থ-প্রচলনের সত্যিকার সূত্র হল ‘অর্থ—পণ্য—অর্থ’ এবং এইসঙ্গে অর্থের কিছুটা বৃদ্ধি (অ—প—অ)। অর্থের এই বৃদ্ধিকেই মার্কস উদ্ধৃত-মূল্য বলেছেন।

পুঁজি হিসাবে বিচলনে অর্থের স্ব-প্রসারণ ঘটে, তখন তা ‘স্বর্ণাডিম্ব প্রসবের’ সামর্থ্য পায়, উদ্ধৃত-মূল্য

আনে। পুঁজি হল স্ব-প্রসারণশীল মূল্য বা উদ্ভূত-মূল্য সৃষ্টিকারী মূল্য।

কীভাবে অর্থ বৃদ্ধি পায়? উদ্ভূত-মূল্যের উৎস কী?

কোন কোন বুদ্ধিজীয়া অর্থনীতিবিদ বলেন যে খোদ সংবহন প্রক্রিয়ায় মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু, মূল্যের নিয়ম অনুসারে সংবহনের এলাকায় সমতুল্যই বিনিময়, অর্থাৎ সমতুল্য মূল্যই বিনিময় করা হয়। কোন কোন পুঁজিপতি স্বভাবতই অন্যদের ঠকাতে পারে, কিন্তু বিক্রেতা হিসাবে যারা যেটুকু অর্জন করে, ক্রেতা হিসাবে অন্যরা সেটুকু হারায়। মূল ঘটনা হল গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যই পুঁজি বৃদ্ধি পায়।

যদি সবগুণি পণ্যই যথামূল্যে বিক্রি ও যথামূল্যে ক্রীত হয়, তাহলে উদ্ভূত-মূল্য কোথা থেকে আসে? মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে উদ্ভূত-মূল্যের রহস্যটি আবিষ্কার করেন।

পুরো ব্যাপারটি হল বাজারে পুঁজিপতি এমন পণ্য খুঁজে পায় যার ব্যবহার-মূল্যের একটি অনন্য ধর্ম রয়েছে, অর্থাৎ তা নিজের যেটুকু মূল্য রয়েছে তার চেয়ে অধিকতর মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। সেই বিশিষ্ট পণ্যটি — শ্রমশক্তি।

৯। পণ্য হিসাবে শ্রমশক্তি

শ্রমশক্তি হল একজন মানুষের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যের মোট যোগফল, যা বৈষয়িক পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে সে ব্যবহার করে। শ্রমশক্তি যেকোন সমাজেই উৎপাদনের

একটি অপরিহার্য উপাদান, কিন্তু কেবল পুঁজিতন্ত্রের আওতায়ই তা পণ্য হয়ে ওঠে এবং এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন শ্রমশক্তির মালিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। কিন্তু এককভাবে তা-ই যথেষ্ট নয়। কোন শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে অন্য কোনভাবে নিজ পরিবার ভরণপোষণের সুযোগ থাকলে সে পুঁজিপতির দ্বারস্থ হবে না। মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে আনুর্ভাসিক একটি কৌতূহলপ্রদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জনৈক ইংরেজ ম্যানুফ্যাকচারার রবার্ট পীল অস্ট্রেলিয়ায় একটি কর্মশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার মেশিনপত্র ও কাঁচামাল জাহাজে তোলে, সঙ্গে নেয় সন্তানাদি সহ কয়েক হাজার পুরুষ ও নারী একথা ভেবে যে ওরা তার কর্মশালায় কাজ করবে। ধনদৌলতের আশা নিয়েই সে যাত্রা শুরুর করে। কিন্তু, অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে তার আশাভঙ্গ ঘটে। এমনকি ব্যক্তিগত ভৃত্যরাও তাকে ত্যাগ করে। তারা সকলেই পশুপ্রজন ও চাষাবাদ শুরুর করে, কেননা সেকালে অস্ট্রেলিয়ায় অঢেল খালি জমি ছিল, যেকোন ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারত। তাই পীলের ধনী হওয়ার লোভনীয় পরিকল্পনাটি সাবানের বদ্বদদের মতোই ফেটে গিয়েছিল।

তাই ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন শ্রমিককে মজদুরনির্ভর প্রলেতারিয়েত বানাতে হলে তাকে অবশ্যই উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে এবং এইসঙ্গে জীবনধারণের উপায় থেকেও বঞ্চিত করতে হবে।

অন্য যেকোন পণ্যের মতো শ্রমশক্তি নামক পণ্যেরও মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য আছে। শ্রমশক্তি পণ্যের মূল্য

তা 'উৎপাদনের' জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমকালের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শ্রমশক্তি একটি বিশিষ্ট পণ্য, এর বাহক মানুষ, আর মানুষের বাঁচার ও কাজের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পানীয় ও পোশাকের এবং শ্রমের পর বিশ্রামের। এই পণ্য 'উৎপাদনের' জন্য শ্রমিককে অবশ্যই যোগাতে হয় জীবনধারণের যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, আর ওগদূলি সংগ্রহের জন্য তার অবশ্যই চাই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। তাই, পুঁজিপতির কাছে বিক্রীত শ্রমশক্তির জন্য শ্রমিকের অবশ্যই পাওয়া প্রয়োজন নিজের জীবিকার্জনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ।

অধিকন্তু, শ্রমশক্তি পণ্যের মূল্যের মধ্যে থাকা চাই শ্রমিকের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য, কেননা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যিক নতুন শ্রমশক্তির অবিরাম অন্তরপ্রবাহ। বস্তুত, শ্রমিক পরিবারের শিশুদের পুঁজিপতিরা অদূর ভবিষ্যতে শোষণের সম্ভাবনাশীল উপকরণ হিসাবেই দেখে। ঈগল যেভাবে শিকারকে দেখে, পুঁজিপতিরাও ঠিক তেমনিই শ্রমিকসন্তানদের দিকে তাকায়। একটি প্রাচীন উপকথায় বলা হয়: একটি ঈগল এক তিতরকে এক দঙ্গল বাচ্চা পোষার জন্য প্রশংসা করে একে একে বাচ্চাগদূলিকে ছেঁা মেরে বাসায় নিয়ে যেত। পুঁজিপতি সেভাবেই শ্রমিকসন্তান শ্রমের উপযোগী হওয়া মাত্রই তাকে ছেঁা মেরে তুলে নেয়, যাতে সে মেশিন চালায়, পুঁজিপতির ধনসম্পদ বাড়ায়।

শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্যে আরও থাকে শিক্ষা ও

প্রশিক্ষণের খরচা, কেননা শ্রমিকের কিছুটা জ্ঞান থাকা, নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকা চাই। শ্রমিকের দক্ষতা যত বেশি থাকে, তার শ্রমশক্তির মূল্যও ততই বাড়ে। কিন্তু তখন শ্রমিকের মানসিক চাহিদার দাবিও বেড়ে ওঠে: সিনেমা দেখা, বইপত্র পড়া, ইত্যাদি। আর এগুলির খরচাও তার শ্রমশক্তির মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অর্থের পরিমাণে প্রকটিত শ্রমশক্তির মূল্য হল শ্রমশক্তির দাম এবং তা পুঁজিতন্ত্রে মজদুরির রূপগ্রহণ করে। পুঁজিপতিরা সাধারণত শ্রমশক্তি কেনে তার মূল্যের চেয়ে কম দামে ও এভাবে নিজেদের মুনাকা বাড়ায়।

পণ্য হিসাবে শ্রমশক্তির ব্যবহার-মূল্যও আছে, যাতে থাকে মজদুরি-শ্রমিকের নতুন মূল্য সৃষ্টির সামর্থ্য, যে-মূল্য তার খোদ শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি। আর ঠিক এজন্যই পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের নিয়োগ করে।

উদ্ধৃত-মূল্য আসে শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন শ্রম থেকে, যা পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি ক্রয়ের মাধ্যমে একতরফা আত্মসাৎ করে। এই হল পুঁজিতন্ত্রের আওতায় এক স্বকীয় ব্যবস্থাপনা এবং তাতেই পুঁজিতন্ত্রের সহজাত শোষণশীল সারবস্তু সহজলভ্য।

শ্রমিকের রক্তচোষা এক বাদুড়

মেহনতিদের শোষণের মাধ্যমে, অর্থাৎ উদ্ভূত-মূল্য উৎপাদন ও আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিরা বিত্তশালী হয়। মার্কস পুঁজিকে রক্তচোষা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা করেন, যে ‘জীবন্ত শ্রম শোষণ করেই কেবল বাঁচে, আর যত বাঁচে ততই বেশি শ্রম শোষণ করে।’* লেনিনের ভাষায় মার্কসের উদ্ভূত-মূল্যের তত্ত্ব তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিস্তম্ভ এবং তিনি পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের প্রকৃতির উদ্ঘাটক।

১। পুঁজিতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বর্জ্যের স্থায়ী ও অসীম সমৃদ্ধির — তার একক ও প্রধানতম লক্ষ্যেই — পরিচালিত। যে-পথে এই লক্ষ্য

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, p. 224.

অর্জিত হয়, যে-কৌশলে উদ্ভূত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎ করা হয়, যাবতীয় ছদ্মবেশ সরিয়ে মার্ক'স 'পুঁজি' গ্রন্থে তা সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করেন।

পুঁজিপতি কারখানা নির্মাণ, মেশিন-টুল ও কৃৎকৌশল সরঞ্জামে তা সাজানো, সেখানে কাঁচামাল ও জ্বালানি সঞ্চার, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এবং একইসঙ্গে মূল্যসৃষ্টিতে সমর্থ শ্রমশক্তি নামের পণ্যটি বাজার থেকে ক্রয়ের জন্য নিজ অর্থ ব্যবহার করে।

পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করে, সেটাকে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে যুক্ত করে, অর্থাৎ শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য কাজে লাগায় ও গোটা প্রক্রিয়াটি চালু করে। মার্ক'সের বর্ণাঢ্য বর্ণনায়: 'আগে যে টাকার কুমির ছিল এবার পুঁজিপতি হিসাবে লম্বা পা ফেলে সামনে এগোয়; শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিক হিসাবে তাকে অনুসরণ করে। একজন হামবড়া ঠাটে, দেঁতোহাসি হেসে ব্যবসায় মন দেয়; অন্যজন, ভীরু ও অনিচ্ছুক, যেন নিজের চামড়াটাই বাজারে এনেছে আর কিছুই আশা করছে না, কেবল নিজেকে লুকাতে চায়।'*

পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগে শ্রমপ্রক্রিয়ার দুটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে: পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকরা কাজ করে, এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পণ্যে পুঁজিপতির মালিকানা বর্তায়, সে কোন পণ্য, কতটা

* প্রাগ্ভূত, পৃঃ ১৭২।

ও কীভাবে উৎপন্ন হবে তাও নির্ধারণ করে। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় শ্রমপ্রক্রিয়ার এই সুনির্দিষ্ট দিকগুলিই মজদুর-শ্রমিকের শ্রমকে একজন কৃতদাসের নির্ধাতনমূলক শ্রমে রূপান্তরিত করে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন তদনুযায়ী নিজেও দ্বিবিধ: একদিকে, এটি ব্যবহার-মূল্য স্রষ্টা একটি প্রক্রিয়া, অন্যদিকে, মূল্যবর্ধক প্রক্রিয়াও এবং পরিশেষে তা নির্ধারিত হয় মজদুর-শ্রমিকদের শ্রমের দ্বিবিধ ধর্ম দ্বারা। শ্রমিকদের মদূর্ত শ্রম সৃষ্টি করে নতুন ব্যবহার-মূল্য, তাতে স্থানান্তরিত হয় উৎপাদনের উপায়ের মূল্য। একইসঙ্গে তাদের বিমদূর্ত শ্রম একটি নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, যাতে থাকে শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য ও একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধি — উদ্ধৃত-মূল্য, যা পুঁজিপতিরা পুরোপুরি আত্মসাৎ করে। মার্কস বলেন যে ‘মূল্য যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য সংরক্ষণের যে-ধর্ম কর্মরত শ্রমশক্তির রয়েছে তা প্রকৃতির দান, তাতে শ্রমিককে কিছুই খোয়াতে হয় না, কিন্তু পুঁজিপতির পক্ষে তা খুবই সুবিধাজনক।’*

তাই, উদ্ধৃত-মূল্য হল একটি মূল্য যা সৃষ্টি করে মজদুর-শ্রমিকের শ্রম আর নির্দিধায় দখল করে নেয় পুঁজিপতি। এমনকি, যদি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি যথামূল্যে ক্রয় করে ও উৎপন্ন সামগ্রী যথামূল্যেই বিক্রি করে, তথাপি তারা মজদুর-

* জি, পৃ: ২০০।

শ্রমিকের শ্রম থেকে উদ্ধৃত-মূল্য আদায় করে নেবে।

কীভাবে তা ঘটে?

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমিকদের পুরো শ্রমটুকু দ্বিধাবিভক্ত হয়। কর্ম-দিবসের একাংশ ধরে সে তার শ্রমশক্তির সমতুল্যের মূল্য সৃষ্টি করে। কর্ম-দিবসের এই অংশটি তার শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন এবং এভাবে শ্রমিক ও তার পরিবারের অস্তিত্বের নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন। এজন্যই তা আবশ্যিকীয় শ্রম-সময় হিসাবে পরিচিত। আবশ্যিকীয় শ্রম-সময়ের পরিসরে ব্যয়িত শ্রম — হল আবশ্যিকীয় শ্রম। কিন্তু, পুঁজিপতিরা শ্রমিককে আবশ্যিকীয় শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত সময় খাটায়, আর এজন্যই পুঁজিপতি শ্রমিককে ভাড়া করে। মজদুর-শ্রমিক আবশ্যিকীয় শ্রম-সময়ের বাড়তি যে-সময়টুকু খেটে নিজের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য, অর্থাৎ উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে, তাকে সেজন্য কিছুই দেয়া হয় না। বলা বাহুল্য, এই উদ্ধৃত-মূল্যই পুঁজিপতি শ্রেণীর মূল্যফা ও সম্পদের উৎস। কর্ম-দিবসের এই শেষাংশ হল উদ্ধৃত শ্রম-সময় এবং এই সময় ব্যয়িত শ্রম হল উদ্ধৃত শ্রম। পুঁজিপতিরা যখন উদ্ধৃত-মূল্য আত্মসাৎ করে তখন তারা মজদুর-শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন উদ্ধৃত শ্রম সার্থকভাবে আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ কার্যত পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ করা।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্ভাব্য বৃহত্তম পরিমাণ উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি ও আত্মসাৎের মধ্য দিয়েই ক্রিয়া-কলাপ চালায় এবং এটাই তার প্রধান ও চূড়ান্ত

অর্থনৈতিক নিয়ম। এই নিয়ম পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূললক্ষ্য — মূনাফার নির্ধারকই কেবল নয়, একইসঙ্গে মূনাফা আদায়ের, অর্থাৎ মজদুর-শ্রমিক শোষণের মূল পথটিরও প্রদর্শক। মার্কসের ভাষায়: ‘...পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের নির্দেশক প্রেরণা, পরিণতি ও লক্ষ্য হল সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ উদ্ধৃত-মূল্য আদায় এবং ফলত সম্ভাব্য সর্বাধিক মাগ্রায় শ্রমশক্তি শোষণ।’*

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ধরনের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের গুপ্ত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত করে এবং বুদ্ধিজীয়া সমাজে চলমান প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলীর নিগূঢ় ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যোগায়। উদ্ধৃত-মূল্যের নিয়ম পুঁজিপতিদের দ্বারা মজদুর-শ্রমিকদের শোষণের সম্পর্ক, শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীয়ার মধ্যকার সম্পর্কগুলি প্রকটিত করে — যেগুলি হল পুঁজিতন্ত্রের আওতায় মূল শ্রেণী-সম্পর্ক। পুঁজিতন্ত্রের যাবতীয় অসঙ্গতি পরিশেষে ওই নিয়মের সন্ধিস্বত্বের প্রভাবেই দূরিত ও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

২। পুঁজি ও পুঁজির খণ্ডাংশ

উদ্ধৃত-মূল্য পুঁজির ত্রিস্বাকলাপের মূল ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

পুঁজি কি?

* প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৩।

সাধারণতম পরিভাষা অনুসারে পুঁজি হল মূল্য (অর্থ ও উৎপাদনের উপায়ের রূপে), যা মালিকের জন্য উদ্ভূত-মূল্য যোগায়, অর্থাৎ মজদুর-শ্রমিকের শোষণের ফল হিসাবে নিজেকে প্রসারিত করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুঁজির প্রত্যয় অবশ্যই বুদ্ধিজীয়া সমাজের প্রধান শ্রেণীগণের মধ্যকার সামাজিক ও উৎপাদনী সম্পর্কগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই শ্রেণীগণ: পুঁজিপতি, যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং মজদুর-শ্রমিক, যারা কেবল নিজেদের শ্রমশক্তির অধিকারী ও তা বিক্রি করেই বেঁচে থাকে।

কীভাবে পুঁজির উদ্ভব ঘটে?

এসম্পর্কে একটি ঘুম-পাড়ানি গল্প আজও পশ্চিমে চালু আছে: পুঁজি প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল পুঁজিমালিকের কর্মনিষ্ঠা থেকে — মিতব্যয়ী এবং অলস ও অপব্যয়ীরা যথাক্রমে বিপুলশালী ও মজদুর-শ্রমিক হয়েছিল।

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন অর্থনীতিবিদ জর্জ হিলডার লিখিত 'সম্পদ ও দারিদ্র্য' বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখকের মতে সম্পদের স্রষ্টা হল কঠোর কর্মিষ্ঠ মানুষ ও তাদের উৎসাহদান উচিত, আর দারিদ্র্যের স্রষ্টা হল কুণ্ডে লোক ও উদ্যোগহীনরা। দারিদ্র্যে নিষ্পেষিতদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভণ্ডামীপূর্ণ উপদেশ: খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করুন, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করুন, মধ্যরাত পর্যন্ত বাতি নিভাবেন না। তিনি যে পুঁজিপতিদের কট্টর সমর্থক তাতে

সন্দেহের অবকাশ নেই। ধনীদের কাছ থেকে আরও বেশি ছিনিয়ে গরীবদের দিলে, তাঁর মতে তাতে কেবল প্রথমোক্তের পুঁজিলগ্নি ও ফলত উৎপাদন কমবে, বেকারি বাড়বে, সৃষ্টি হবে আরও দারিদ্র্য। এই ধরনের ধারণা নিয়েই আজকাল তৈরি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সরকারের অর্থনৈতিক বাইবেল।

কিন্তু, সম্পদ অবশ্যই পুঁজিপতিদের আত্যন্তিক মিতব্যয়িতা ও শ্রমের ফসল নয়। এমনকি কোন পুঁজি কঠিন শ্রমের ফসল হলেও তাতে গোটা ছবির কোনই পরিবর্তন ঘটে না, কেননা এই পুঁজিপতিরা অচিরেই তাদের প্রাথমিক পুঁজির পুরোটাই খরচ করে ফেলত, যদি-না তারা উদ্ধৃত-মূল্যের স্রষ্টা মজদুর-শ্রমিকদের শোষণ করতে পারত।

সবাই জানে যে বার্জেয়ারা প্রতি বছরই পুঁজি বাড়িয়ে চলে। অন্যান্য সহ মার্কিন ধনকুবের দ্যুপোঁ, রকফেলার, ফোর্ড ও মেলন বিপুল বিত্তের মালিক। দৃষ্টান্ত হিসাবে, নিউ ইয়র্কের ধনকুবের ডি. কে. ল্যুডভিগের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার।

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের উপর আরও আলোকপাতের জন্য মার্কস পুঁজির উপাংশে বিভাজন বিশ্লেষণ করেন এবং পুঁজি ও পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের কৌশল সঠিকভাবে বঝতে তা সাহায্য দেয়।

মার্কসের মতে পুঁজির দুটি অংশ: স্থির পুঁজি — উৎপাদনের উপায়ে অঙ্গীভূত; অস্থির পুঁজি — শ্রম-

শক্তি ক্রয়ে ব্যয়িত। উদ্ভূত-মূল্য কেবল অস্থির পুঁজি দ্বারাই, অর্থাৎ মজদুর-শ্রমিকের শোষণ দ্বারাই সৃষ্ট। পুঁজিপতির জন্য শ্রমিক যতবেশি উদ্ভূত-মূল্য উৎপাদন করে গোটা পুঁজির বৃদ্ধি ততই ত্বরিত হয়, অর্থাৎ পুঁজিপতির আরও ধনসম্পদ বাড়ে।

পুঁজি কর্তৃক শ্রমিক শোষণের মাত্রা নির্ধারণের জন্য মার্কস দুটি সূচক প্রবর্তন করেন: উদ্ভূত-মূল্যের মোট পরিমাণ (বা এর চূড়ান্ত পরিসর) ও উদ্ভূত-মূল্যের হার (অস্থির পুঁজির পরিসর সাপেক্ষে এর পরিসর)।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পে উদ্ভূত-মূল্যের হার ছিল ১০০ শতাংশের সামান্য বেশি, আর ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে বহু শিল্পের বৃহৎ উদ্যোগসমূহে উদ্ভূত-মূল্যের হার দাঁড়ায় ৩০০ শতাংশ ও ততোধিক। যেমন, নিউ ইয়র্কের শিল্পে ১ ডলার মজদুরের বিনিময়ে শ্রমিকরা আপন শ্রমে উৎপাদন করে ৪.২৫ ডলারের সমান মূল্য।

উদ্ভূত-মূল্যের হার (বা শ্রমিক শোষণের মাত্রা, যা একই জিনিস) যত উঁচু থাকে ও যত অধিক সংখ্যক শ্রমিক পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগে নিযুক্ত হয়, পুঁজিপতিরা ততই বেশি পরিমাণ উদ্ভূত-মূল্য আত্মসাৎ করে, তাদের উপার্জন ততই বেশি।

কীভাবে পুঁজিপতিরা উদ্ভূত-মূল্যের মোট পরিমাণ ও হার বাড়ায়?

৩। মেহনতিদের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির দৃষ্টি পথ

শ্রমিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য পুঁজিপতিরা দৃষ্টি প্রধান উপায় ব্যবহার করে।

প্রথমত, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য সরাসর বৃদ্ধি, যাতে অভিন্ন আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের সঙ্গে উদ্ধৃত শ্রম-সময় বৃদ্ধি পায় ও শ্রমিকের শোষণ তীব্রতর হয়। এভাবে কোন পুঁজিপতি কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য ৮ ঘণ্টা (৪ ঘণ্টা আবশ্যকীয় ও ৪ ঘণ্টা উদ্ধৃত শ্রম-সময়) থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ালে উদ্ধৃত শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা দাঁড়ায়, আর উদ্ধৃত-মূল্যের হার দেড় গুণ বাড়ে ও তার মোট পরিমাণও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়।

আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর মাধ্যমে অর্জিত উদ্ধৃত-মূল্যকে অনাপেক্ষিক উদ্ধৃত-মূল্য বলে। উদ্ধৃত-মূল্যের জন্য পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষা অসীম বিধায় ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে তারা সর্বদাই কর্ম-দিবস চরম সীমা পর্যন্ত বাড়াতে চায় এবং সম্ভব হলে শোষকরা শ্রমিকদের দিনরাত খাটাত। কিন্তু যেহেতু তা অসম্ভব (কেননা মানুষকে দিনের একটা অংশ বিশ্রাম, আহার, নিদ্রায় খরচ করতে হয়) সেজন্য কর্ম-দিবসের একটা বাস্তব সীমানা থাকে। কর্ম-দিবসের নৈতিক সীমানাও রয়েছে, কেননা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদাগুলি মেটানোর জন্যও শ্রমিকের সময় প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণীর দীর্ঘ ও অটল সংগ্রামের দরুন অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই কর্ম-দিবসের বৈধ সীমানা

নির্ধারিত হয়েছে: অগ্রগামী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর্ম-সপ্তাহের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য এখন ৪০-৪৬ ঘণ্টা।

কিন্তু, এমনকি আধুনিক পরিস্থিতিতেও পুঁজিপতিরা কর্ম-সপ্তাহ বাড়ানোর পথ খুঁজে পায়। তাই দেখা যায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ২৫-৩০ শতাংশ শ্রমিকের কর্ম-সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ৪৫ ঘণ্টার বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটিরও বেশি নরনারী সাধারণত মান-শ্রম-সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাজ করে এবং এদের ৬০ লক্ষ সপ্তাহে খাটে ৬০ ঘণ্টা ও তার চেয়ে বেশি, আর অনেকেই অতিকালীন কাজের কোন পারিশ্রমিক পায় না। বিদেশী শ্রমিকরা খুবই দুর্ভাগ্য। ইতালিতে তাদের প্রায় ৮০ শতাংশ রোজ ১০ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় কাজ করে এবং স্থানীয় শ্রমিকদের চেয়ে কম পারিশ্রমিকে।

পুঁজিপতিরা শ্রম-নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিন্ন দৈর্ঘ্যের কর্ম-দিবসের পরিসরে অনাপেক্ষিক উদ্ভূত-মূল্যের উৎপাদন বাড়ায়।

কীভাবে তা সম্ভব?

শ্রম-নিবিড়তা বৃদ্ধির অর্থ — শ্রম-সময়ের অভিন্ন সময়টুকুতে শ্রমিকেরা অধিকতর প্রাণশক্তি খরচা করে এবং এভাবে বৃহত্তর মূল্য ও তদনুযায়ী অধিকতর পরিমাণ উদ্ভূত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের সর্বশক্তি ও প্রাণপণে খাটানোর জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতিককে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ‘জেনারেল মোটরস’, ‘জেনারেল

ইলেকট্রিক' ও অন্যান্য অনেকগুলি মার্কিন কর্পোরেশনে বহু সংখ্যক শ্রমিকের ফ্রিয়াকর্মের উপর নজর রাখার জন্য স্বয়ংক্রিয় 'টেলিকন্ট্রল' প্রণালী বসান হয়েছে, এতে প্রতি ৩৬ সেকেন্ড পর পর আলো ও শব্দ সংকেতের মাধ্যমে পরিদর্শনের ফলাফল ব্যবস্থাপকদের কাছে পৌঁছয়। প্রত্যেকটি শ্রমিকের শ্রম-নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য মার্কিন মোটর নির্মাতা 'ক্রাইসলার' কর্পোরেশন তার ডেট্রয়েট কারখানায় কম্পিউটার ব্যবহার করে। সংযোজন লাইনে শ্রমিক লাগানোর শত শত ধরন থেকে কম্পিউটার তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ তীব্রতা সহ শ্রমিকদের খাটানোর দর্শটি সেরা ধরন বেছে নেয় এবং ইঞ্জিনিয়ার অতঃপর সকলের জন্য এগুলিরই একটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন 'বৈজ্ঞানিক' নীতি অনুসারে শ্রমিকদের উৎপাদনে লাগানোর দৌলতে আগের তুলনায় তাদের কাছ থেকে ২০-২৫ শতাংশ বেশি প্রাণশক্তি আদায় করা যায়।

উদ্ভূত-মূল্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় পথ — কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য অটুট রেখে আবশ্যিকীয় শ্রম-সময় কমান যাতে আনুষঙ্গিক উদ্ভূত শ্রম-সময় বৃদ্ধি পায়।

ধরা যাক, ৮ ঘণ্টার কর্ম-দিবসে আবশ্যিকীয় শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টার স্থলে ৩ ঘণ্টা হল। এই অবস্থায় উদ্ভূত শ্রম-সময় বেড়ে ৫ ঘণ্টা হবে ও উদ্ভূত-মূল্যের হার

বেড়ে ১০০ শতাংশ থেকে $\left(\frac{৪ \text{ ঘণ্টা}}{৪ \text{ ঘণ্টা}} \times ১০০\% \right)$ ১৬৭

শতাংশে $\left(\frac{৫ \text{ ঘণ্টা}}{৩ \text{ ঘণ্টা}} \times ১০০\% \right)$ পৌঁছবে। এভাবে অর্জিত

উদ্ভূত-মূল্যকে আপেক্ষিক উদ্ভূত-মূল্য বলে।

কিন্তু পুঁজিপতিরা কীভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমাতে পারে?

পুনরায় স্মরণ করা যাক — আবশ্যকীয় শ্রম-সময় নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তির মূল্যে, যা আবার নির্ভর করে জীবনধারণের উপায়ের মূল্যের (খাদ্য, বস্ত্র, পাদুকা, ভাড়া, ইত্যাদির দাম) উপর। জীবনধারণের উপায়ের মূল্যহ্রাস হল শ্রমিকদের নিজের জন্য কাজের সময় কমান ও পুঁজিপতির জন্য তা বাড়ানোর সামির। ব্যাপক জনসাধারণের জন্য প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদক শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তা অর্জিত হতে পারে।

নারী ও শিশু শ্রমের ব্যাপক ব্যবহারও শ্রমশক্তির মূল্যহ্রাসের একটি হেতু হতে পারে, কেননা তারা এখন আপন জীবিকার্জন করলেও পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পায়।

নারী ও শিশুদের শ্রমশোষণ এমনকি আজও বহু পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বহুব্যাপ্ত: জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, ইতালি, স্পেন ও ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ শিশু শোষিত হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেত্রে মজুরের ২০ শতাংশই শিশু; একটি সরকারী তথ্যানুসারে তুরস্কে ১০ লক্ষ শিশু মজুর হিসাবে খাটে এবং রাজিলের নানা শিল্পে ১ কোটি শিশু কাজ করে, যাদের অনেকেরই বয়স ৬ বা ৭ বছর।

নারী ও শিশু শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার স্বভাবতই পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শ্রমের মূল্যহানি ঘটায় এবং

এভাবে আপেক্ষিক উদ্ধৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধির একটি হেতু হিসাবে কাজ করে।

অতিরিক্ত (বাড়তি) উদ্ধৃত্ত-মূল্য হল পুঁজিপতিদের আদায়ীকৃত আপেক্ষিক উদ্ধৃত্ত-মূল্যের একটি ধরন, যারা নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বা শ্রমসংগঠনের উন্নতি ঘটিয়ে তাদের পণ্যের একক মূল্যকে ওগদুলির সামাজিক মূল্যের স্তরের নিচে নামায়। বাজারদর সামাজিক মূল্য দ্বারা নির্ধারিত বিধায় এই পুঁজিপতিরা কেবল সাধারণ উদ্ধৃত্ত-মূল্যই নয়, অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত-মূল্যও পায় এবং যতদিন না অন্যান্য পুঁজিপতিরাও তাদের নিজেদের পণ্যমূল্য কমায় ততদিন পর্যন্ত এই প্রাপ্তি অব্যাহত থাকে।

অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত-মূল্য সেইসব পুঁজিপতিরাই পায় যারা শ্রমসংগঠনের অধিকতর নিখুঁত পদ্ধতি ও সেগদুলির ব্যাপক প্রচলনের আগে অধুনাতন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এজন্যই পুঁজিপতিরা নিজেদের উৎপাদনের ‘গোপনীয়তা’ রক্ষায় এতটা তৎপর, যাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এর কোন হদিস না পায় ও অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত-মূল্যে ভাগ বসাতে না পারে।

যেভাবেই উদ্ধৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হোক তার ধরনটি সর্বদাই শ্রমিকের শোষণ তীব্রতর করার একক লক্ষ্যে তৈরি।

তা ছাড়াও পুঁজিপতিরা বাড়তি মূল্যফা লোটে শ্রমিকদের স্বার্থের বিনিময়ে, তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের সমতুল্য না দিয়ে তারা শ্রমশক্তি পণ্যের দামের একটি নির্দিষ্ট ধরন — মজদুরি ব্যবহার করে, যা হল

শ্রমিকদের শোষণ তীব্রতর করার ও এইসঙ্গে শোষণ সংগোপনের একটি উপায়। ফ্রান্সের মিশলেন একই নামের বৃহৎ ফরাসী কোম্পানির অন্যতম মালিক একটি সস্তা ছোট মোটরগাড়ি করে কারখানাগুলি পরিদর্শনে যান, শ্রমিকদের সঙ্গে খোশগল্পের জন্য বারবার কর্মশালাগুলিতে থামেন, কর্মদর্শন করেন, যাতে তা সকলের নজরে পড়ে। তিনি যে একজন সাধারণ মানুষ, তাঁর মজদুরদের মতোই, তা প্রমাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু নিজেরা সত্য হল মিশলেনের কারখানায় খেটে চলেছে তাদের মজদুরি কোটি কোটি ফ্রাঁ। আর যেসব মানুষ সারাজীবন মিশলেনের কারখানায় খেটে চলেছে তাদের মজদুরি সরকারীভাবে ঘোষিত জীবনযাত্রার সর্বনিম্ন খরচারও কম। তাদের এই মজদুরি দিয়ে মিশলেন ও অন্যান্য পুঁজিপতি শ্রমিকদের বোঝাতে চান যে তারা যা অর্জন করে তাই তাদের দেয়া হয়, অতএব এতে বোধ্য কোন শোষণ নেই।

৪। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে মজদুরি

মজদুরি বৃদ্ধোন্মুখ সমাজে শ্রমের দাম — একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ — হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যেমনটি মনে হয় মজদুরি সঠিক তা নয়। এর কিছু কারণ আছে।

শ্রমশক্তি নামের পণ্যটি ক্রয়ের সময় পুঁজিপতি তা থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ শ্রম আদায়ের প্রয়াস

পায়। শ্রমিক নিজের দিক থেকে তার শ্রমের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশা করে। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দিক থেকে বিষয়ীগত পদক্ষেপ এই ধারণা সৃষ্টি করে যে এখানে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে শ্রম, শ্রমশক্তি নয়।

অধিকন্তু মজদুরির ধরন ও বেতনের দিনগুলির ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যে কাজ করার পর শ্রমিক মজদুরি পায়, যাতে দেখায় যে সে মজদুরি পাচ্ছে তার পুরো শ্রমটুকুর জন্য: শ্রমিক কাজ করে এক বা দু' সপ্তাহ ধরে কিংবা এক মাস ধরে, তারপর মজদুরি দেয়া হয় এমন ভান সহকারে যেন সে পুরো শ্রমের পারিশ্রমিকই পাচ্ছে। মজদুরি আবশ্যকীয় ও উদ্ধৃত শ্রমের বিভাগ লুকিয়ে রাখে, শোষণের সম্পর্ক আড়াল করে। বর্জ্যেয়া তান্ত্রিকরা দাবি করেন যে এই বাহ্যিক রূপটিই আসলে সারবস্তু, অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন হল তাদের শ্রমের পুরো পারিশ্রমিক, অর্থাৎ এতে কোন শোষণ নেই, শোষণ থাকাও সম্ভব নয়।

আসলে, আমরা দেখেছি, পুঁজিপতিরা শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করে না, ক্রয় করে তাদের শ্রমের সামর্থ্য, অর্থাৎ শ্রমশক্তি।

শ্রমিকের শ্রমক্রয় অসম্ভব কেন?

প্রথমত, পুঁজিপতি যখন একজন শ্রমিক ভাড়া করে তখনো শ্রমের কোন অস্তিত্ব থাকে না, কেননা শ্রম একটি প্রক্রিয়া যাতে শ্রমশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সৃজনশীলভাবে প্রযুক্ত হয় এবং স্বভাবতই তা ঘটে শ্রমিক আপন শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পর। যে-শ্রমপ্রক্রিয়ার

ফলটুকু শ্রমিকের বদলে পায় পুঁজিপতি, তা নিষ্পন্ন হয় উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তি যুক্ত হওয়ার পর।

দ্বিতীয়ত, শ্রম মূল্যস্ফট্টা, কিন্তু সে নিজে মূল্যহীন। মূল্য হল পণ্যে মূর্ত হওয়া শ্রম। খোদ শ্রমের মূল্য থাকলে প্রতিপাদিত হত যে শ্রমই শ্রম সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয়ত, পুঁজিপতিরা শ্রমিককে শ্রমের পুরো দাম দিলে তার পক্ষে উদ্ধৃত-মূল্য আত্মসাৎ অসম্ভব হত এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন পুঁজিপতির জন্য অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত।

পুঁজিতন্ত্রের আওতায় মজদুরির সারবস্তু এই যে সেখানে শ্রমশক্তির মূল্য ও দাম থেকে মজদুরিকে ধর্মাস্ত্রিত (ছন্দবেশ পরান) করা হয়। মার্কসের ভাষায়: ‘মজদুরি যেমনটি দেখায়, যথা শ্রমের মূল্য বা দাম নয়, শ্রমশক্তির মূল্য বা দামের একটি নকল রূপমাত্র।’*

পুঁজিতন্ত্রের আওতায় মজদুরির সারবস্তু তার রূপগদুলির মধ্যে সরাসর প্রকটিত হয়, এগদুলির প্রধান রূপ হল সময় হিসাবে মজদুরি, তাতে শ্রমের জন্য শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ভর করে কার্যকালের উপর

* Karl Marx, ‘Critique of the Gotha Programme’, in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 23.

(ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস) এবং ঠিকা-মজুরির রূপের উপর — সময় হিসাবে মজুরির একটি পরিবর্তিত রূপ — যা সময়ের একটি এককে তৈরি পণ্যের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সময়ভিত্তিক ও ঠিকা-মজুরি ভিত্তিক কয়েকটি ঘর্মস্রাবী মজুরি পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এইসবগুলিরই লক্ষ্য ছিল তীব্রতর শোষণ এবং তা লুকানোর সুষ্ঠুতর ব্যবস্থা। মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রিডরিখ টেইলার উদ্ভাবিত মজুরি ব্যবস্থার ভিত্তিতে তৈরি এই প্রণালীগুলিতে অধিক উৎপাদনের হার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি কার্যসম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত ছিল। উৎপাদনের হার পূরণ ও অতিপূরণের জন্য মজুরির হার কিছুটা বাড়ত এবং অ-পূরণের জন্য ‘পিটুনি’ মজুরি হিসাবে পারিশ্রমিক কমত। উৎপাদনের হার এমনই ছিল যে অধিকাংশ শ্রমিকই সেগুলি পূরণ করতে পারত না। প্রসঙ্গত লেনিনের আনুষ্ঠানিক মন্তব্যটি উল্লেখ্য: টেইলার পদ্ধতি ‘বুর্জোয়া শোষণের সুসংস্কৃত বর্বরতা ও শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের এক সমাহার।’*

একদা ইঞ্জিনিয়ার ও পরে প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ডও নিজস্ব মজুরির ঘর্মস্রাবী পরিকল্পণার মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ শ্রম আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। কনভেয়র-লাইনের

* V. I. Lenin, ‘The Immediate Tasks of the

দ্রুততর বিচলনে শ্রমিকদের শোষণ তীব্রতর করা হয়েছিল। লাইনের গতিবেগ বাড়ান হয়েছিল মিনিটে ২ থেকে ৩ মিটার ও পরে ৪ মিটার, তা শ্রমিকদের প্রাণান্ত শ্রমে ও অধিক শক্তিক্ষরণে বাধ্য করেছিল, বেতন যদিও-বা বাড়ান হয়, যৎসামান্য। পদ্ধতির দৌলতে বহু শ্রমিক অচিরেই শূন্য খোলকে পরিণত হয়, ৪০ — ৫০ বছরের মধ্যে তারা কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়ে ও তৎক্ষণাৎ চাকুরি হারায়।

আজকাল ‘মুনাফা-অংশীদারী’, ‘বোনাস ব্যবস্থা’ ও অন্যান্য মজুদির পরিকল্প ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। ‘মুনাফা-অংশীদারী’ ব্যবস্থার অর্থ — মূল মজুদির ছাড়াও বছরের শেষে হিসাব-নিকাশের পর উদ্যোগের মুনাফার ‘অংশ’ হিসাবে শ্রমিকের কিছুটা বাড়তি মজুদি লাভ। এতেও কার্যত শ্রমিকের মজুদি তার শ্রমশক্তির মূল্যের বেশি হয় না, কারণ মূল বেতন নির্ধারিত হয় কম হারে। অধিকন্তু, ‘অংশ’ হিসাবে দেয় এই মুনাফা যৎসামান্য, ‘মুনাফা-অংশীদারী’ ব্যবস্থার আওতাধীন কর্পোরেশনের মোট বেতন তহবিলের ২ শতাংশেরও কম।

‘বোনাস’ পরিকল্প থেকে উৎপাদনের হারের অতিপূরণ, উৎপাদের উন্নততর মান ইত্যাদির জন্য মূল বেতনের অতিরিক্ত কিছুটা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে।

Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 27, 1977, p. 259.

এইসব পরিকল্পনা শ্রমিকের শ্রমের বাড়তি ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাকে আরও প্রাণান্ত পরিশ্রমে প্ররোচিত করে।

মেহনতি মানদুশের বিভিন্ন বর্গের শ্রমের পারিশ্রমিক দেয়ার সময় পুঁজিপতিরা ব্যাপকভাবে বৈষম্য ব্যবহার করে। তাদের মুনাবাফা বৃদ্ধির এটাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। উদ্বাস্তু শ্রমিকরা আজকাল এই ভিত্তিতে তীব্রতম শোষণের শিকারে পরিণত।

১৯৮০-র মধ্যদশকে পশ্চিম ইউরোপে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পিলে-চমকান — নানা হিসাবে ১.৫ কোটি থেকে ২ কোটি। সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলিতে বিশেষত অধিক সংখ্যক বিদেশী শ্রমিক রয়েছে এবং তাদের একটা বড় অংশই অবৈধ আগন্তুক। সরকারী দলিলপত্র ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটির বেশি। এরা অতি শোষণের শিকার, কেননা তারা যথানিয়মে ততটা সুসংগঠিত নয় এবং এজন্য পুঁজিপতিদের অত্যধিক দাবিদাওয়া রোধও তাদের সাধ্যাতীত। অধিকন্তু, পুঁজিপতিরা বিদেশী শ্রমিকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে শক্তসমর্থ ও শ্রমিষ্ঠদেরই বেছে নেয়, এবং সামাজিক বীমা, অসুস্থতার ভাতা, বার্ষিকের পেনসন ও অন্যান্য সুবিধা না দিয়ে তাদের উপর চরম শোষণ চালায়। পুঁজিপতিরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বাভাবিক কর্মপরিস্থিতির ব্যবস্থা এড়িয়েও ব্যয়সাপ্রয় করে, এইসব শ্রমিক চরম নির্যাতনের মধ্যে, বস্তুত উনিশ শতকের গোড়ার দিকের পরিস্থিতিতেই খাটতে বাধ্য

হয়। এই শ্রমিকের প্রধান নিয়োগকারী — ক্ষুদ্র কারখানা, নির্মাণ দপ্তর, খামার ও কর্মশালার মালিকরা নিম্নতম মজুরি, অতিরিক্ত সময় খাটুনি ও শিশুশ্রমের আইনগুলি মেনে চলে না। বিদেশী নারীশ্রমিকরা পোশাক তৈরির কারখানায় সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অবিরাম খাটে এবং এমনকি কখন কখন কারখানা বন্ধ হওয়ার পর বাড়ি গিয়ে বাকি কাজটুকু সেরে তৈরি পোশাকগুলি সকালে জমা দেয়। এই ধরনের পোশাক কর্মশালার অধিকাংশই রয়েছে জরাজীর্ণ দালানের চিলেকোঠা বা উপরের তলাগুলিতে এবং এইসব নোংরা ঘরে ও অঙ্গনে লোক ঠেসে থাকে। গরমের প্রচণ্ড তাপ ও শীতের দঃসহ ঠান্ডায় সেলাইকলের উপর সারাদিন কুঁজো হয়ে থেকে কাজ করার জন্য এই নারীশ্রমিকরা পায় ভিক্ষাতুল্য যৎকিঞ্চিৎ মজুরি।

৫। নামিক ও প্রকৃত মজুরি

পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে শ্রমিককে দৈবাৎ তার পুরো মজুরি নগদশোধ করা হত। সেকালে পুঁজিপতিরা সাধারণত কারখানার গুদাম থেকেই শ্রমিকদের বাজারের তুলনার চড়া দরে নিম্নমানের খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করত। মাস বা মরশুমের শেষে কারখানার মালিক হিসাবনিকাশের পর শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে জিনিসপত্রের দাম কেটে রাখত। এমনটি প্রায়ই ঘটত

যখন শ্রমিক খুব কমই ফেরৎ পেত বা শূন্যহাতে ফিরত (প্রায়শই ঋণী থাকত)। আজকাল এই ধরনের পরিশোধ কোন কোন উন্নয়নশীল দেশেই শৃঙ্খল চালান আছে। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে মজদুরি নগদশোধই নিয়ম।

নগদ হিসাবে প্রকটিত মজদুরিকে নামিক মজদুরি বলা হয়। এগুলির পরিমাণ থেকে এককভাবে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের কোনই হৃদিস মেলে না, ভোগ্যপণ্য ও কৃত্যকের দরের স্তরের উপরও তা নির্ভর করে। সেজন্যই প্রকৃত মজদুরি শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে শৃঙ্খলিত ধারণা দেয়, কেননা এই মজদুরি হল পণ্য ও কৃত্যকের পরিমাণ, যা কর ও অন্যান্য প্রদেয় কেটে নেওয়ার পর একজন শ্রমিক তার মজদুরি দিয়ে ক্রয় করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকের প্রকৃত মজদুরি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে: উল্লেখ্য মাত্রায় শ্রম-নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাবল্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির খোদ অস্তিত্ব এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের দরুন পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কিছুটা সুবিধাদানে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের পর্যাপ্ত শোষণবৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের দিকটা ভালই গড়িয়েছে। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদ প্রকৃত হিসাবে ১০০ শতাংশ বাড়াতে পেরেছে, অথচ প্রকৃত মজদুরি বাড়িয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ, যাকে বলা যায়

‘সাদা বীটমূল থেকে লাল রস নিংড়ানোর’ চমৎকার ফন্দি।

যুদ্ধোত্তর কালপর্বে প্রকৃত মজদুরি হ্রাসের প্রবণতাটিও অব্যাহত রয়েছে। মদ্রাস্ফীতি বা মদ্রার অবচয় ও মদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ব্যাপক মেহনতির অবস্থার উপর সর্বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দৈনন্দিন জীবনে মদ্রাস্ফীতির অর্থ হল জীবনযাত্রার অটল ব্যয়বৃদ্ধি এবং ভোগ্যপণ্য ও কৃত্যকের দরবৃদ্ধি।

যুদ্ধকাল ও যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম বছরগুলি থেকে ১৯৭০-র দশকের ‘শুরুর পর্যন্ত উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে দরবৃদ্ধি মোটামুটি সহনীয় থাকার পর হঠাৎ পণ্য ও কৃত্যকের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্যমান ‘চুপিসারে চলা’ মদ্রাস্ফীতি সর্বত্র ‘ধাবমান’ হয়ে ওঠে এবং তা নানা কারণে: অসুপ্রতিযোগিতার মতো অনুৎপাদী বিপুল ব্যয়, তড়িঘড়ি ও অনিয়ন্ত্রিত বিবিধ ধরনের ঋণদান বিস্তার, অগ্রগামী শিল্প-কর্পোরেশনগুলির যদৃচ্ছা দরনির্ধারণ, কোথাও কোথাও কাগজী মদ্রার আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা সমর্থন।

মজদুরি কার্ষত দরবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে ব্যর্থ হয় এবং সেজন্যই মজদুরি ও বেতন অর্জনকারী আর পেনসনভোগীরাই মদ্রাস্ফীতির কারণে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক দুর্ভোগ পোহায় এবং বৃজোঁয়ারা মদ্রাস্ফীতির বোঝাটি দিবি্য ব্যাপক মেহনতির ঘাড়ে চাপায়। অনেক পুঁজিপতি নিজেদের স্বার্থানুকূলো সামাজিক আয় পুনর্বণ্টনে মদ্রাস্ফীতি কাজে লাগায়।

সেজন্যই আমরা দেখি যে পুর্নজিপিতিরা শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্ধৃত-মূল্য আদায়ের জন্য যাবতীয় বৈধ এবং প্রায়শ অবৈধ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। বর্জ্যের প্রধান লক্ষ্য উদ্ধৃত-মূল্য উৎপাদন ও আত্মসাৎ এবং পুর্নজিতান্ত্রিক সমাজে জীবন মোটামুটি এই লক্ষ্যেই পরিচালিত।

তৃতীয় অধ্যায়

শোষক গোষ্ঠীর ‘পবিত্র জোট’

একটি আর্মেনীয় উপকথা: ঘোড়া ও ষাঁড়ের মধ্যে কে বড় — এ নিয়ে ঝগড়া বাধে। অভিজাত ঘোড়া ষাঁড়কে ঘৃণা করত, কেননা রাজা, রাজকুমার ও অভিজাতদের সৌজন্যে তার গায়ে ছিল মণিরত্নখচিত সাজ, খেতো সেরা জাতের গম। ষাঁড় কেবল বলল: ‘আমি দেশহিতের প্রতীক। আমি খাটি, যন্ত্রণা পাই, পরিশ্রান্ত হই, যাতে তুমি ও তোমার প্রভুদের অন্ন জোটে আমারই ফসলে। আমি কাজ থামালে তোমার রাজা, রাজকুমার আর তুমি নিজে অনাহারেই অন্ধা পাবে।’

সেই পুরকাল থেকেই পরশ্রমে অনেকের বেঁচে থাকার রেওয়াজটি চলছে: তারা

দাসমালিক, সামন্তপ্রভু, বণিক ও মহাজন। এরা সবাই ছিল শোষক এবং তাদের মতো লোক আজও অটেল। ইদানীংকালে এরা মূলত পুঁজিপতি, যারা মজদুর-শ্রমিকদের কোন পারিশ্রমিক না দিয়েই তাদের সৃষ্ট উৎস-মূল্য আত্মসাৎ করে।

উৎস-মূল্য সৃষ্টি করে মজদুর-শ্রমিকের শ্রম, যারা খাতে বৈষয়িক পণ্যোৎপাদনে, প্রধানত শিল্প, কৃষি ও নির্মাণ ক্ষেত্রে। এইসব শাখায় পুঁজিলাভিকারী পুঁজিপতিরাই উৎস-মূল্য আত্মসাৎ করে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য শোষকগোষ্ঠীও আছে যারা তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে বাণিজ্য, ফিনান্স ও ঋণদানে। এদের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী বদজোয়া ও ব্যাংকমালিক, আরও আছে বড় বড় জমিদারির মালিক। এইসব গোষ্ঠী পুঁজিপতি শ্রেণীর মোট আয়ের উপর নিজেদের অংশভাগ দাবি করে (এবং পায়) এবং শোষকদের ‘পবিত্র জোঁট’ বা ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে তোলে। শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্ট মোট উৎস-মূল্য কেন ও কীভাবে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাংকমালিক ও জমিদারদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয় এবার আমরা তা আলোচনা করব।

১। গড় মূল্য ও উৎপাদনের দাম

বিভিন্ন পুঁজিপতির মধ্যে উৎস-মূল্যের পুনর্বণ্টন বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকেই শুরু হয়।

মূল্যমাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি

আর মদুনাফা তো উদ্ধৃত-মদুল্যেরই নামান্তর। কিন্তু, পুঁজিপতি ভান করে যে মদুনাফার উৎস আসলে তারই আগাম-দেওয়া মোট পুঁজি, অর্থাৎ স্থির ও অস্থির পুঁজিতে তার যাবতীয় খরচা, বা যাকে বলে উৎপাদন-ব্যয়। পুঁজিপতির জন্য মদুনাফা হল একটি পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে বিক্রয়দামের বাড়তি অংশটুকু। এজন্যই মার্কস মদুনাফাকে উদ্ধৃত-মদুল্যের রূপান্তরিত ধরন বলেছিলেন। মদুনাফার রূপ হিসাবে উদ্ধৃত-মদুল্য মজদুর-শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের সঙ্গে তার যাবতীয় চাক্ষুষ সংযোগ হারিয়ে বসে, অথচ এটাই তার সত্যিকার উৎস।

একজন পুঁজিপতি তার উদ্যোগটি কতটা লাভজনক তা বিচারে মদুনাফার হারকেই সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। মদুনাফার হার হল ব্যয়িত গোটা পুঁজি আর উদ্ধৃত-মদুল্যের অনূপাত (শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত)। তাই আগাম-দেওয়া পুঁজি ৪ লক্ষ ডলার, যার ৩ লক্ষ ২০ হাজার ডলার স্থির পুঁজি, ৮০ হাজার ডলার অস্থির পুঁজি এবং এক বছরের উদ্ধৃত-মদুল্য ৮০ হাজার ডলার (অর্থাৎ উদ্ধৃত-মদুল্যের হার ১০০ শতাংশ) হলে মদুনাফার হার দাঁড়াবে ২০ শতাংশ।

তাই দেখা যায় মদুনাফার হার আসলে উদ্ধৃত-মদুল্যের সত্যিকার উৎসটিকে, অর্থাৎ মেহনতিদের শোষণকে ঢেকে রাখে।

মদুনাফার হার কীসের উপর নির্ভরশীল? প্রধানত উদ্ধৃত-মদুল্যের হারের উপর, অর্থাৎ শোষণের মাত্রার উপর: শোষণের মাত্রা যতবেশি মদুনাফার হারও ততই

উঁচু। মুনাকার হার আরও নিৰ্ভর করে স্থির ও অস্থির পুঁজির অনুপাতের উপর, পুঁজির প্রত্যাবৃ্ত্তির কালের উপর। সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাকার হার লাভের চেষ্টায় পুঁজিপতিরা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় নামে। প্রতিযোগিতা হল বেসরকারী শিল্পোদ্যোগীদের সর্বোচ্চ মুনাকা ও নিজ নিজ পুঁজির সেরা লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল। পুঁজিপতিদের এই প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই এবং পরিস্থিতিটি যথার্থই মাৎস্যন্যায়ের: কেবল ছোটদের গলাধঃকরণেই বড়দের টিকে থাকা সম্ভব। এঙ্গেলস বলেছিলেন যে এই প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গতম অভিব্যক্তি হল ‘সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই’, আর এটাই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্তা।*

অন্তঃশাখীয় ও আন্তঃশাখীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্তঃশাখীয় প্রতিযোগিতা হল অভিন্ন পণ্যোৎপাদক, শিল্পের এক ও অভিন্ন শাখার পুঁজিপতিদের মধ্যে লড়াই। যাদের উৎপাদনের পরিস্থিতি উন্নততর তারাই বাড়তি মুনাকা পায়, যাদের তা নেই তারা লোকসান দেয়, কখনো দেউলিয়া হয়। অভিন্ন শাখার প্রতিযোগিতা সেই শাখায় পুঁজিপতিদের একক মুনাকার হারকে সমান করে দিতে চায়।

* Frederick Engels, ‘The Condition of the Working Class in England’, in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 375.

আন্তঃশাখীয় প্রতিযোগিতা হল শিল্পের বিভিন্ন শাখার পুঁজিপতিদের মধ্যে লড়াই এবং তাতে বিভিন্ন শাখার মুনাজার হার সমান করার প্রবণতা দেখা যায়। মুনাজার হার সর্বোচ্চ করার জন্য পুঁজি অবাধে শাখা থেকে শাখান্তরে প্রবাহিত হওয়ার দরুন নানা শাখার মুনাজার বিভিন্ন হার মুনাজার গড় হারে পৌঁছয়। উচ্চতর মুনাজার হারের শাখাগুলিতে পুঁজির প্রবাহ ওইসব শাখায় উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করে, সেজন্য পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বাড়ে, দাম কমে, এবং ফলত মুনাজার হারও নামতে শুরু করে। অতঃপর পুঁজি ওই শাখা থেকে অন্যতর শাখায় প্রবাহিত হয়, যেখানে মুনাজার হার উচ্চতর এবং এভাবে মোটামুটি একই, গড় মুনাজার হার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে।

সমাজে উৎপন্ন গোটা উদ্ভূত-মূল্য পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাজার সাধারণ তহবিলে পরিণত হয় এবং তা থেকে লগ্নিকৃত পুঁজিরপরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেক পুঁজিপতি তার অংশভাগ পায়। আগাম-দেওয়া মোট পুঁজির সঙ্গে সমাজে উৎপন্ন মোট উদ্ভূত-মূল্যের অনুপাতই মুনাজার গড় হারটি নির্ধারণ করে এবং যে-কৌশলে মুনাজার গড় হার গঠিত হয় তা থেকেই প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার হেতুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেননা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ তীব্রতর করার মধ্যেই তো পুঁজিপতিদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ নিহিত।

মুনাজার হার গড় হয়ে ওঠার দরুন পুঁজিতন্ত্রের

আওতায় পণ্যসমূহ তাদের যথার্থ মূল্যের বদলে বিক্রি হয় উৎপাদনের দামে এবং এই দাম হল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের খরচা (আগাম-দেওয়া স্থির ও অস্থির পুঁজি) ও পুঁজির উপর গড় মূনাফার যোগফল। কিন্তু তাতে মূল্যের নিয়মভঙ্গ বোঝায় না, কেননা গোটা সমাজের পরিসরে পণ্যের মোট মূল্যের সঙ্গে উৎপাদনের মোট দাম সমানই থেকে যায়, আর গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীর মূনাফা সমাজে উৎপন্ন উদ্ধৃত-মূল্যের মোট পরিমাণের সমান। সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনের আওতায় মূল্যের নিয়ম উৎপাদনের দামের মাধ্যমেই সচল থাকে।

২। বাণিজ্যিক পুঁজি ও বাণিজ্যিক মূনাফা

শিল্প-পুঁজিপতিরা মোট মূনাফাটি এই নীতি অনুসারে ভাগ করে: সমান পুঁজির জন্য সমান মূনাফা, এবং একটা অংশ যায় অন্যান্য পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাছে, বিশেষত বণিক বর্জেরার কাছে। দেখা যাক, কেন এমনটি প্রয়োজন।

পুঁজির অবিরাম বিচলন, উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির একত্র সংযোগ এবং সেগুদলি অবিরাম চালু থাকার শর্তেই কেবল উদ্ধৃত-মূল্য উৎপন্ন হতে পারে। এই বিচলন থেমে গেলে, পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগে শ্রমপ্রক্রিয়া বন্ধ হলে নতুন মূল্য, উদ্ধৃত-মূল্যের কোনটাই উৎপন্ন হয় না। মার্কসের ভাষায়: ‘পুঁজি...

কেবল চলিষ্ণু হিসাবেই বোধ্য, নিশ্চল বস্তু হিসাবে নয়।’*

পুঁজির বিচলন কীভাবে কার্যকর হয়?

পুঁজিপতি কর্তৃক প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় থেকেই পুঁজির বিচলন শুরু হয়। পুঁজি তার বিচলনের প্রথম পর্যায়ে পণ্য-সংবহনের পরিমন্ডলেই প্রথম কার্যকর করে: পুঁজির মদ্যরূপ তার উৎপাদনী রূপে পরিবর্তিত হয়। পণ্যরূপে উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং এগুটির মূল্য সৃষ্ট উৎকৃষ্ট-মূল্যের আয়তনের দরুন দ্বিতীয় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি। তৃতীয় পর্যায়ে পুঁজি-সংবহনের পরিমন্ডলে প্রত্যাবর্তন করে: তৈরি পণ্যগুটি বিক্রি হয়ে যায় এবং উৎপন্ন উৎকৃষ্ট-মূল্যও আদায় করা হয়। পণ্যরূপ থেকে পুঁজি পুনরায় তার অর্থরূপে প্রত্যাবর্তন করে।

বিক্রয়ের লাভ থেকে পুঁজিপতিরা আরেকবার উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি ক্রয় করে এবং পুঁজির বিচলন পুনরাবৃত্ত হয়। একটি ধরন থেকে আরেকটিতে পুঁজির এই ধারাবাহিক রূপান্তর এবং মোট তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পুঁজির গমনকে পুঁজির পরিচলন বলা হয়, যে-ধারায় পুঁজি দু’বার সংবহনের পর্যায় এবং একবার উৎপাদনের পর্যায় অতিক্রম করে।

* Karl Marx, *Capital*, Vol. II, Progress Publishers, Moscow, 1978, p. 108.

উৎপাদনের পর্যায়াটি স্বভাবতই চূড়ান্ত, কেননা ওই পর্যায়াটিই উদ্ধৃত-মূল্যের উৎস।

পুঁজির বিচলন একটি পরিক্রমে সীমিত থাকে না, এগুলা অন্তহীন পুনরারম্ভের মধ্য দিয়ে একটি অন্যটিকে অনুসরণ করে চলে। পুঁজির পরিক্রম একটি পৃথক ক্রিয়া নয়, তা পর্যায়িকভাবে আবর্তক প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখা দেয় এবং তাকে পুঁজির প্রত্যাবৃ্ত্তি বলে। পুঁজিপতিরা পুঁজির প্রত্যাবৃ্ত্তি স্বরণে উৎসাহী হয়ে থাকে, কেননা উদ্ধৃত-মূল্যের বার্ষিক হার পরিমাপ করা হয় আগাম-দেওয়া অস্থির পুঁজির সঙ্গে সারা বছরে অর্জিত মোট উদ্ধৃত-মূল্যের অনুপাত হিসাবে। পুঁজির দ্রুততর প্রত্যাবৃ্ত্তির দৌলতে এক বছরের মেয়াদে একই অস্থির পুঁজির সাহায্যে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ ও শোষণ করা যায় এবং যথোচিত বড় অঙ্কের উদ্ধৃত-মূল্য অর্জিত হয়।

দ্রুততর পুঁজির প্রত্যাবৃ্ত্তির চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও মূল্যের রূপে বিদ্যমান পুঁজির অংশ পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের ধারায় পৃথকীকৃত হতে এবং আপন অধিকারে বার্ণিজ্যিক ও ঋণের পুঁজি হিসাবে সক্রিয় হতে চায়, এই ধরনের পুঁজিগুলা ব্যবসায়ী, ব্যাংকমালিক ও অন্যান্য ঋণদাতা পুঁজিপতির মতো বুদ্ধিজীবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী কাজে লাগায়।

বার্ণিজ্যিক পুঁজি সংবহনের পরিমণ্ডলে শিল্প-পুঁজির একাংশ হিসাবে কাজ করে, যা পৃথক রাখা হয়েছিল তার পণ্যরূপের কর্মসম্পাদনের জন্য। শিল্প-পুঁজিপতিরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি

করে এবং শেষোক্তরা সেগদুলি খন্দেরদের কাছে পৌঁছায়। পণ্যবিনিময়ে মধ্যগ হিসাবে উদ্ধৃত-মূল্য আদায়ই বাণিজ্যিক পণ্ডির কাজ। বাণিজ্যিক পণ্ডির বিচলনের ধরন হল মুনানফা সহ বিক্রির জন্য পণ্যক্রয়।

বাণিজ্যিক মুনানফা হল উদ্ধৃত-মূল্যের সেই অংশ যা পণ্ডিপতিরা বিক্রয়কর্মের জন্য ব্যবসায়ীদের দেয়। বাণিজ্যিক পণ্ডি তার মালিকের জন্য সেই অভিন্ন গড় মুনানফাই উৎপাদন করে যা শিল্প-পণ্ডিপতির কাছে পৌঁছয়, কেননা পণ্ডিগদুলি উৎপাদনের পরিমন্ডল থেকে সংবহনের পরিমন্ডলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলার ও ফেরার দরুন সমান পণ্ডির জন্য সমান মুনানফা নীতির ভিত্তিতে মুনানফার হার সমান করার প্রয়াস পায়।

বাণিজ্যিক মুনানফার রূপটি শোষণের সম্পর্কে আরও অস্পষ্ট করে তোলে, কেননা বিক্রেতা তো উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসর যুক্ত নয় এবং তাতে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে বাণিজ্যিক মুনানফা যেন খোদ বাণিজ্য থেকেই আসে, যদিও আসলে তা হল উৎপাদনে মজদুর-শ্রমিকদের সৃষ্ট ও পণ্ডিপতিদের আত্মসাৎকৃত উদ্ধৃত-মূল্যেরই একাংশ। শিল্প-পণ্ডিপতিদের মতো পণ্যবিক্রেতারও ব্যাপক মেহনতিদের শোষণের মাধ্যমে বিত্তশালী হয় এবং অধিকন্তু এদের অনেকেই খন্দেরদের ঠিকিয়ে অর্থসঞ্চয় করে।

পণ্যবিক্রেতার প্রায়শই আসল পণ্যের বদলে বাজে বা সস্তা নকল মাল খন্দেরদের গছায়। কিন্তু, এই

ধরনের কুকর্মের বাড়াবাড়ি অসম্ভব বিধায় পণ্যবিক্রেতারা খন্দেরদের ঠকানোর সুক্ষ্মতর ধরনগুলি কাজে লাগায়। অতএব তারা দাম বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ ধরনের আশ্রয় নেয়, তারা উৎপাদকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে যে শেভার সস্তা হবে কিন্তু র্রেডের দাম চড়া, পদ্তুল সস্তা কিন্তু পদ্তুলের পোশাক মহাঘর্ষ, ইত্যাদি। বিপণীকেন্দ্রের মালিকরা দর-খেলার বড়ো ঘুষুঘু: যেমন সপ্তাহের কোন একদিন মাংসের দর কমানোর ঘোষণা দিয়ে বিনা ঘোষণায় অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়ায়, যাতে খন্দেররা একটি পণ্যের লাভজনক দরে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য জিনিসের জন্য বেশি দাম দেয় এবং সব মিলিয়ে দোকানে বেশি অঙ্কের অর্থ খরচ করে।

খন্দের আকৃষ্ট করার জন্য পণ্যবিক্রেতারা সম্ভাব্য সবকিছু করে। বড় বড় বিপণীকেন্দ্রে থাকে বিশেষ ধরনের আবহ — মৃদু সঙ্গীত, উচ্ছ্বিত ঝরনা, টবে-লাগান পামের শোভা, ইত্যাদি। সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য — খন্দেরদের মন দুর্বল করা, বাধ্য করে ফেলা। ছোট ছোট দোকানগুলি রাস্তার হকার বা ভেণ্ডারদের কাজে লাগায়, তারা কেন্দ্রীয় রাস্তাগুলি দিয়ে ব্রাজিলের চামড়ার ব্যাগ, ইতালির জুতা, ভারতীয় রাউজ, ইত্যাদি বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলে ঠেলে চলে।

আরও আছে লোকজনকে প্ররোচিত করার জন্য কানফাটান ও অবিরাম প্রচার — কিনুন, কিনুন, কিনুন! এসবই ভোগবাদের প্রতি ভক্তি সৃষ্টির জন্য, এর অন্তিম উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে বিলাসিতার জীবানু

সংক্রমণ, অধুনা তম ও ‘মর্ষাদাসুচক’ সামগ্রী ক্রয় ও সপ্তয়ের উদ্দীপনা বিস্তার। একেত্রে মানুষের জন্য বস্তুটির শ্ৰুতপ্রভাবের ব্যাপার অবাস্তবঃ মূলকথা বিক্রয় — হোক দাঁতের মাজন, সাবানের গুঁড়ি, সাধারণ বন্দুক বা সামরিক বিমান। পণ্যবিক্রেতার প্রচার মানুষের সুস্কমতম আবেগ, যৌবন ও সৌন্দর্য এবং বর্বরতা, অসীম দস্ত ও যৌনতার মতো জঘন্যতম এষণা নিয়ে ফটকা খেলে। টিভিতে পুরো এক দল শিশুর প্রত্যেকেই হাতে ইতিমধ্যেই একটি পুতুল রয়েছে এবং ‘তোমার জন্য একটা কিনেছে-না কেন?’ এ প্রশ্ন তুলে বিজ্ঞাপন মা-বাবার কাছ থেকে ওই পুতুল আদায়ের জন্য ক্ষুদ্রে শিশুদের বায়না ধরতে প্ররোচিত করে। এক কাউবয় কেবল একটি চকচকে ছুরি দিয়ে মৃদুহৃতে এক ডজন শত্রু খতম করেছে এমন বিজ্ঞাপন দেখিয়ে কিশোরদের মধ্যে ওই সম্ভাব্য মারাত্মক ছুরিটি সংগ্রহের হুজুগ সৃষ্টি করা হয়। বিজ্ঞাপন প্রায়ই পণ্যের গুণ ও ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয় এবং পণ্যটি কোন ওষুধ বা ভেষজ পদার্থ হলে অনেক সময় তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

৩। ঋণের পুঁজি ও সুদ

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বাণিজ্যিক পুঁজিই নয় অর্থ-পুঁজিও শিল্প-পুঁজি থেকে আলাদা হতে থাকে। ঋণের পুঁজি হল অর্থ-পুঁজি, যা নির্দিষ্ট

মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট সুদে ধার দেয়া হয়। শিল্প বা বণিক পুঁজিপতি তার মুনামার যে-অংশটি ঋণদানের জন্য অর্থ-পুঁজিপতিকে দেয় তা-ই সুদ।

ঋণের পুঁজির বিচলন নিম্নোক্ত সুত্রে প্রকটিত: 'অর্থ — অর্থ যোগ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক বৃদ্ধি'। বাহ্যত তা পণ্য উৎপাদন বা সংবহনকে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং অর্থ-বিচলনের সঙ্গে তা অর্থ আদায় করে: একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর মালিককে কিছুটা বৃদ্ধি সহ পরিশোধের জন্যই ঋণ দেয়া হয়। ঋণের পুঁজির বিচলন মেহনতিদের শোষণের উপায় আরেকটি ঘোমটার আড়াল টেনে দেয়, ঋণদাতা পুঁজিপতি যে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্য থেকে তার অংশভাগ সংগ্রহ করে পুরোপূরি এই সত্যটি লুকায়। ঋণের পুঁজি হল পুঁজির সর্বাধিক পরজীবী রূপ।

ঋণের সুদের উৎস — উদ্ধৃত-মূল্য। শিল্প ও বণিক পুঁজিপতিরা ঋণের পুঁজিকে শ্রমিক শোষণ ও মুনামা আদায়ের জন্য ব্যবহার করে এবং সেজন্যই তারা এর একাংশ ঋণশোধে ছেড়ে দেয়। উৎপাদনে কর্মরত পুঁজিপতির মুনামা দুই ভাগে বিভক্ত: ঋণের সুদ, যা আত্মসাৎ করে ঋণদাতা পুঁজিপতি, আর ব্যবসা-উদ্যোগীর আয়, যা যায় শিল্প-পুঁজিপতির তহবিলে।

সুদ তাই মুনামারই একাংশ। কিন্তু, ঋণদাতা পুঁজিপতি ও শিল্প-পুঁজিপতির মধ্যে মুনামা ভাগের ব্যাপারটি পুরোপুরিই প্রতিযোগিতানির্ভর, অর্থাৎ ঋণের পুঁজির সরবরাহ ও তার চাহিদার তৌলে

নির্ধারণ। সুদে হার হল ঋণের পুঁজির পরিমাণের সঙ্গে সুদের অঙ্কের অনুপাত। মুনাবার গড় হার সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমানা হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে, কিন্তু অতঃপর আর শিল্প-পুঁজিপতির কাছে ঋণগ্রহণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সুদের হার কতটা নামতে পারে তা তদ্রূপ অনুমানের ব্যাপার। সুদের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছলে ঋণদাতা পুঁজিপতির কাছে ঋণদান নিরর্থক হয়ে ওঠে।

ঋণের পুঁজির বিচলন ঘটে প্রধানত ঋণের রূপেই এবং তা মূলত দু'ধরনের: বাণিজ্যিক ঋণ ও ব্যাঙ্ক-ঋণ।

শিল্প-পুঁজিপতি ও বণিক পুঁজিপতিরা পরস্পরকে বাণিজ্যিক ঋণ (ক্রেডিট) দিয়ে থাকে। ম্যানুফাকচারার পায় বাকিতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি, সে তার তৈরি পণ্য পাইকারী বিক্রেতাকে বাকিতে দেয়, শেষোক্তর হাত থেকে তা পৌঁছয় খুচরো বিক্রেতার কাছে। এই ক্রেডিট অর্থ-ঋণের রূপলাভ করে না, পায় পণ্যঋণের রূপ। পুঁজিপতিরা পরস্পরের মধ্যে কোন জামানত ছাড়া, অর্থাৎ প্রত্যর্থপত্র (এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বীকৃত পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকার লিখিত মূদ্রলেখক) ছাড়া পণ্যাবিনিময় করে না।

ঋণদাতা পুঁজিপতি শিল্প-পুঁজিপতি ও বণিকদের বড় অঙ্কের অর্থ যোগানোর জন্য ব্যাঙ্ক-ঋণ ব্যবহার করে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ফিনান্স প্রতিষ্ঠানও জামানত হিসাবে স্থাবর সম্পত্তি,

দালানকোঠা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম (বন্ধকী' ঋণ), জামানত হিসাবে পণ্যদ্রব্য ও অস্থাবর সম্পত্তি সহ এবং কিস্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য (ভোক্তা-ঋণ) ঋণ দিয়ে থাকে। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় ভোক্তা-ঋণের বিস্তার প্রায়শই মেহনতিদের অবস্থার অবনতি ঘটায়, কেননা তাতে চড়া সুদের হার দাবি করা হয়। তদুপরি, ক্রেডিটে বিক্রয় পণ্যের দর সাধারণত চড়া হয়ে থাকে এবং নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার পরিস্থিতিতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়তার পুনর্দখল বর্তায়।

অর্থ-ঋণ ও পরিশোধের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক মধ্যগ হিসাবে কাজ করে। বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক, 'ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা'র ফটকে একটি ব্যতিক্রমী ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে: শিলা-হুৎপিণ্ড। এতে প্রতীকিত ব্যাঙ্কমালিকের হৃদয় — যা শিলার মতো দুর্গল, সর্বাবস্থায় অবিচল। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় নিয়মিত ঘটনা — ঋণ দিতে বা ঋণের মেয়াদ বাড়াতে ব্যাঙ্কের অস্বীকৃতি কৃষক পরিবার কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে ধ্বংস হওয়ার সমান। অর্থ নিংড়ান ছাড়া ব্যাঙ্কমালিকের হৃদয়ে অন্যতর আবেগের অস্তিত্ব অসম্ভব।

ব্যাঙ্ক দায়মুক্ত নগদ অর্থ সঞ্চয় করে এবং ঋণ দেয়। এতে ব্যাঙ্কের যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হয় এবং তা ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধমর্ণদের কাছ থেকে অর্জিত সুদ ও আমানতকারীদের প্রদত্ত সুদের বিয়োগফল। ব্যাঙ্কের মুনাফা উদ্ভূত-মূল্যের একটি রূপান্তরিত

ধরন এবং তা উদ্ভূত-মূল্যের স্রষ্টা মজদুর-শ্রমিকের শ্রম ছাড়া আর কিছ্ছ নয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য ফিনান্স প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অরেকটিও গুরুত্বপূর্ণ ধরন রয়েছে যাতে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মূল্য তহবিলগুলি 'স্বতঃসংগঠিত' হয়ে থাকে। এগুলি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, অর্থাৎ সেইসব উদ্যোগ যেখানে একাধিক ব্যক্তি অর্থলগ্নি করে। একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির মোট পুঁজি গঠিত হয় শেয়ার-মালিকগণ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টক ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থে।

শেয়ার হল একটি জামানত যা কোন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির পুঁজিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থলগ্নির সাক্ষ্যবহ। শেয়ার-মালিক নিজ লগ্নিকৃত অর্থের অনুপাতে ডিভিডেন্ড হিসাবে মূল্য লাভের অধিকারী। প্রত্যেক শেয়ার-মালিকই ওই উদ্যোগের একজন তথাকথিত সহ-মালিক, শেয়ার-মালিকদের সাধারণ সভা — জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির সর্বোচ্চ প্রশাসন সংস্থার অধিবেশনে ভোটদানের অধিকারী।

কিন্তু, প্রধান শেয়ার-মালিকরা, অধিকাংশ স্টকের মালিক পুঁজিপতিরাই কার্যত জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলি চালায়। স্টকের বড় বড় শেয়ার-মালিকরা স্টক-এক্সচেঞ্জ নামে পরিচিত বিশেষ বাজারে জামানত নিয়ে ফটকা কারবার করে, যেখানে তারা স্টক-মার্কেট মূল্যজ্ঞাপনের (কোটেশনের) ওঠা-নামা নিয়ে চাল চালে। এইসব স্টক-এক্সচেঞ্জ বড় বড় ফটকাবাজদের

শিকারভূমি, যারা নগণ্যদের খতম করে তাদের স্টকগুলি কেড়ে নেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে।

জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলির পরিচালক তারাই যারা শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশের মালিক, অর্থাৎ সেই পরিমাণ স্টকের অধিকারী যার দৌলতে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির উপর তার মালিক বা মালিকগোষ্ঠীর সত্যিকার প্রাধান্য বর্তায়। যদিও এই পরিমাণের জন্য বস্তুত ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ইদানীং জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির উপর পুরো প্রভুত্বের জন্য মোট স্টকের ২০-৩০ শতাংশ দখলে রাখাই যথেষ্ট। এরাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি ফয়সালা করে, উদ্যোগের পরিচালকবর্গ হিসাবে নিজেদের লোকজনকে বোর্ডে পাঠায়।

৪। পুঁজিতান্ত্রিক জমির খাজনা

পুঁজিপতিদের শ্রেণী (শিল্প, বণিক, ঋণদাতা পুঁজিপতি) — প্রধান শোষক শ্রেণী ছাড়াও বুর্জোয়া সমাজে আরেকটি মাষক শ্রেণী আছে এবং সে টিকে আছে সেই সামন্তযুগ থেকে: শ্রেণীটি বড় বড় ভূমিমালিক, সর্বোপরি বড় আবাদী জমির মালিকদের নিয়ে গঠিত। তারাও কেন মজদুর-শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট উদ্ভূত-মূল্যের একাংশ আত্মসাৎ করে এবং কীভাবে?

পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্ক হল বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর, অর্থাৎ

জমিমালিক, পুঁজিপতি খামারমালিক, ক্ষেতমজদুর, ক্ষুদ্রে ব্যক্তিগত উৎপাদক বা কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কের একটি গোলকধাঁধা। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ধরন গঠিত হওয়ার সময় এই বিপ্লব কর্তৃক বড় বড় জমিদারি উৎখাতের বদলে ভূমিতে সামন্ত মালিকানাকে ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার রূপান্তরের জন্যই মূলত এমনটি ঘটেছে, যাতে ভূমির অবাধ ক্রয়-বিক্রয় চলে। বড় বড় জমিদারি জমিমালিক, শোষকদের একটি বিশেষ শ্রেণীর, অস্তিত্বের ভিত্তি।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দৌলতে কেন উদ্ধৃত-মূল্যের একাংশ আত্মসাৎ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়?

কৃষি-উৎপাদ যথানিয়মে জমিমালিক নিজে উৎপাদন করে না, করে ধনিক খামারমালিক, একজন প্রজা, যে উদ্ধৃত-মূল্য আদায়ের জন্য খামারের যন্ত্রপাতি কেনে ও মজদুর ভাড়া করে। জমিদার কৃষি-পুঁজিপতিকে জমি ইজারা দেয় এবং বিনিময়ে জমির খাজনা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পায়, যার অঙ্ক ও পরিশোধের মেয়াদ ইজারার চুক্তিপত্রে নির্ধারিত হয়।

পুঁজিপতি খামারমালিক ও জমিদার উভয়ই নির্মমভাবে শোষিত ক্ষেতমজদুরদের শ্রম থেকে নিজেদের আয় সংগ্রহ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ক্যালিফোর্নিয়ার 'ডেল মণ্টো প্রপাইটার কোম্পানির' ক্ষেতমজদুরদের জীবনযাত্রার ধরন উল্লিখিত হতে পারে। তারা থাকে কাঁটাতার ঘেরা কুণ্ডেঘরে; গরমের

দিনে তাপ ও দৃগন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠে, ছাদগুদিল খুবই নিচু আর জানালার বদলে থাকে সরু সরু ফোকর; তারা শোয় শতচ্ছিন্ন গদি-ঢাকা তারের জালের উপর; শীতে ঘর গরম রাখার বা কম্বলের কোন ব্যবস্থা নাই, যদিও তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাত্তের ৭ ও ৮ ডিগ্রি সের্টিগ্রেড নিচে; নেই কোন চিকিৎসা ব্যবস্থাও; অথচ যেসব হাঁস তারা পোষে সেগুদিল দেখাশোনা করে সদৃশ পশুচিকিৎসকরা, গরুগুদিল থাকে চমৎকার গরম-রাখা, আরামদায়ক গোয়ালে। মজদুররা কাজ শুরুর করে সকাল ৪টায়, শেষ করে রাতে। হাড়ভাঙ্গা এই খাটুনির জন্য মজদুরি এতই সামান্য যে অনেকেই বিছানা, খাবার, ক্ষেতপারাপার সহ অন্যান্য 'সুবিধার' জন্য কোম্পানির ঋণ শোধতে বছরের পর বছর খাটে।

ধনিক খামারমালিক ক্ষেতশ্রমিকের কাছ থেকে উদ্ধৃত-মূল্য আদায় করে তার সেই অংশটিই রাখে যা গড় মুনাকার সমান, আর গড় মুনাকার অতিরিক্ত পুরোটাই যায় জমির খাজনা হিসাবে জমিদারের তহবিলে।

পুঞ্জিতন্ত্রের অধীনে জমির খাজনার দুটি ধরন: পার্থক্যমূলক জমির খাজনা ও অনাপেক্ষিক জমির খাজনা।

ব্যাপারটি এই যে জমিদারদের অব্যাহত খাজনা প্রাপ্তির অর্থ হল কৃষিতে গড় মুনাকার উপর উদ্ধৃত-মূল্যের স্থায়ী বাড়তি অংশ উৎপন্ন হয় এবং ওই বাড়তিটুকুই কেবল খাজনার উৎস।

তাহলে কীভাবে এই স্থায়ী বাড়তি অতি-মুনাফা উৎপন্ন হয়? কৃষিতে এর উৎস কী?

গড় মুনাফার অতিরিক্ত এই মুনাফাটুকু ধনিক খামারমালিকের জন্য আসে জমির সীমিত এলাকা এবং ব্যক্তিগত অর্থনীতির বিষয় হিসাবে জমিতে তথাকথিত একচেটিয়া অধিকার থাকার পরিণতি হিসাবে, যে-একচেটিয়া অধিকার কৃষি-উৎপাদনের অঙ্কুত দামগঠনের পথ খোঁজে ও যা পার্থক্যমূলক জমির খাজনার উদ্ভব ঘটায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে শিল্পে পণ্যদর উৎপাদনের গড় পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কৃষিতে নিকৃষ্টতম জমিতে উৎপাদনের পরিস্থিতিই সেগগুলির নির্ধারক। ঘটনা হল: স্বভাবতই ভাল ও মাঝারি জমির পরিমাণ সীমিত, তা যদিও বাড়ান চলে না, অথচ সমাজে কৃষি-উৎপাদের চাহিদা এত বেশি যে এমনকি নিকৃষ্টতম জমির এলাকাও চাষাধীন থাকে। কেবল সেরা ও মাঝারি ধরনের জমির ফসল চাহিদা পূরণে অসমর্থ বিধায় খামারের ফসলের উৎপাদনের দাম নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদনের পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে, অন্যথা এই ধরনের জমির এলাকা চাষাবাদের আওতায়ই আসবে না। সেরা ও মাঝারি জমিতে উৎপাদনের খরচা নিকৃষ্টতম জমির তুলনায় কম এবং সেজন্য ওইসব জমির একক উৎপাদনের দামও উৎপাদনের সামাজিক দামের চেয়ে নিচু। এই হল সেই বিয়োগফল যা থেকে ধনিক খামারমালিকরা জমিদারকে সেরা ও মাঝারি জমির পার্থক্যমূলক জমির খাজনা যোগায়।

কিন্তু জমিদাররা কেবল সেরা ও মাঝারি জমির খাজনাই নয়, নিকৃষ্টতম জমিরও খাজনা চায় ও পায়। শ্রমই মূল্যের কারণ — এই মতবাদের সঙ্গে বিরোধাল্প না হয়ে এই ধরনের খাজনার প্রকৃতি কীভাবে ব্যাখ্যায়? এটা কি মোটেই সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব বৈকি। বিষয়টি এরূপ: ব্যক্তিগত অর্থনীতির একটি বিষয় হিসাবে জমিতে একচেটিয়ার পাশাপাশি (যার ভিত্তিতে পার্থক্যমূলক জমির খাজনার উদ্ভব) পুঁজিতান্ত্রিক কৃষিতে আরেক ধরনের একচেটিয়াও বিদ্যমান এবং তা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একচেটিয়া অধিকার, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয় হিসাবে জমি জমিদাররা একচেটিয়া করে নেয়, তাদের প্রত্যেকের দখল থাকে জমির এলাকার উপর এবং ইচ্ছামতো তা বিলিবন্দেজ করে। একজন ধনিক খামারমালিক একটি জমিতে পুঁজিলাগ্নির সদুযোগ পাবে কি না তা জমিদারের উপরই নির্ভর করে।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একচেটিয়া অধিকারের দরুন নিকৃষ্টতম জমি সহ সকল জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় আদায় করা হয় এবং তা-ই মান নির্বিশেষে যেকোন জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা সৃষ্টি করে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একচেটিয়া অধিকার একমাত্র মালিক ছাড়া অন্য সকলের পক্ষে যেকোন উৎপাদনমূলক কাজে খাজনা ছাড়া জমি ব্যবহারের সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়।

কীভাবে ধনিক খামারমালিকের পক্ষে এমনকি

নিকৃষ্টতম জমি থেকেও গড় মদুনাফার উপর অতিরিক্ত উপার্জন সম্ভব?

এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন খামারের উৎপাদ বিক্রি হয় নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদনের দামে নয়, উৎপাদনের সামাজিক দরের চেয়ে বেশি দামে, যাতে নিকৃষ্টতম জমির মালিকও তার জমি থেকে আয়ের নিশ্চয়তা পেতে পারে। সেজন্য কৃষি-উৎপাদের বাজারদরে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে নিকৃষ্টতম জমির উৎপাদনের খরচা ও গড় মদুনাফা ছাড়াও অনাপেক্ষিক জমির খাজনা।

ঠিক এভাবেই কৃষি-উৎপাদের দাম আকার লাভ করে। এটা ঘটে এজন্য যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একচেটিয়া অধিকার শিল্প থেকে কৃষিতে পুঁজির অবাধ প্রবাহ প্রহত করে, অর্থাৎ তা পুঁজিপতিদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজে উৎপন্ন গোটা উদ্ধৃত-মূল্যের পুনর্বণ্টনে বিঘ্ন ঘটায়। অভিন্ন পুঁজিতে শিল্পের তুলনায় কৃষিতে অধিকতর উদ্ধৃত-মূল্য উৎপন্ন হয়, কেননা কৃষিতে মজুরের মাথাপিছু প্রাপ্তব্য কৃৎকৌশলগত সুবিধাদির স্তর নিম্নতর, আর পুঁজির ১০০ এককে অস্থির পুঁজির এখানে শিল্পের তুলনায় খরচা বেশি, অর্থাৎ কৃষিতে অস্থির পুঁজির সঙ্গে স্থির পুঁজির অনুপাত সর্বদাই কম। কৃষিপণ্য উৎপাদনের দামে বিক্রি হয় না, হয় মূল্যে এবং পুঁজিপতি ইজারাদার কৃষিক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরদের সৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্যের পুরোটাই আত্মসাৎ করে। এর পরিসর সকল পুঁজিপতির প্রাপ্ত গড় মদুনাফার সমান, তা পুঁজি

যেখানেই খাটুক, এবং এইসঙ্গে গড় মুনানফার উপরে বাড়তি উদ্ধৃত-মূল্যেও। এটা হল অতি-মুনানফার পদরোটা, যা নিকৃষ্টতম জমি সহ সকল জমি থেকে জমিদার অনাপেক্ষিক জমির খাজনার আকারে আত্মসাৎ করে।

লক্ষণীয়, অনাপেক্ষিক ও পার্থক্যমূলক খাজনার মতো নমুনাসই খাজনা ছাড়া একচেটিয়া খাজনা নামে আরেকটিও খাজনা আছে। কোন বিশেষ ধরনের খামার-ফসল, যেমন সেরা জাতের আঙুর, অকালের ফল ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত একচেটিয়া দাম নির্ধারিত হলেই একচেটিয়া খাজনার উদ্ভব ঘটে।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জমির খাজনার পরিসর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আমরা শিল্পের মুনানফা, বাণিজ্যিক মুনানফা, সুদ ও জমির খাজনার উৎপত্তি পরীক্ষা করেছি এবং দেখিয়েছি যে উদ্ধৃত-মূল্যের স্রষ্টা মজদুর-শ্রমিকের শ্রমই বুদ্ধিজীবীদের সকল গোষ্ঠী ও জমিদারদের আয়ের একমাত্র উৎস। যেভাবে চাঁদ সূর্য থেকেই তার আলোটুকু পায় তেমনি বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের আয়টুকু সংগ্রহ করে শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্য থেকে।

শেষক — ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে — উৎপন্ন উদ্ধৃত-মূল্যের সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ আত্মসাতের জন্য প্রাণপণ করে এবং এভাবে উৎপন্ন মোট মুনানফার হিস্যাভাগ করে। তাই মার্কস বলেছেন: ‘পুঁজিপতিরা গোটা শ্রমিক শ্রেণীর মুখোমুখি একটি খাঁটি ভ্রাতৃসংঘী

সমাজ গড়ে তোলে, কিন্তু তাদের মধ্যকার
প্রতিযোগিতায় ভালবাসার বিন্দুমাত্র অবকাশও থাকে
না।’*

মজুর-শ্রমের সৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্যের হিস্যাভাগে
শোষকরা সম্মিলিত থাকে। তাদের অভিন্ন লক্ষ্য:
মেহনতিদের সর্বাধিক মাত্রায় শোষণ এবং তাদের কাছ
থেকে যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণ পারিশ্রমিকহীন
শ্রম নিষ্কাশন। সেজন্যই শোষকরা শ্রমিক শ্রেণী ও
বুর্জোয়া সমাজের অন্য সব শোষিত স্তরের বিরুদ্ধে
ঐক্যফ্রন্টে সংঘবদ্ধ।

* Karl Marx, *Capital*, Vol III, Progress Publishers,
Moscow, 1974, p. 198.

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ

আবার স্মরণ করা যাক পুঁজিতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের স্থলবর্তী হয়েছিল যখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা পথ ছেড়ে দিয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানাকে: একটি শোষণমূলক ব্যবস্থার বদলি হয়েছিল আরেকটি শোষণমূলক ব্যবস্থা। বাষ্পচালিত যন্ত্র তখন উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং ম্যানুফাকচারের জায়গায় এসেছিল পুঁজিপতিদের পরিচালিত বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বৃহৎ শিল্প বিশ্বজোড়া বাজার সৃষ্টি করেছিল, তাতে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল বাণিজ্য, জাহাজ চলাচল ও স্থলপরিবহণের (রেলপথ ও মহাসড়ক) এবং এগুনের কল্যাণে আরও

সম্প্রসারিত হয়েছিল শিল্পোৎপাদন, উদ্যোগের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি, মজদুর-শ্রমিকের সংখ্যাগত শক্তিবৃদ্ধি, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির বিকাশ, ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবীরা তাদের পুঁজি বহুগুণিত করার সঙ্গে সঙ্গে তা মধ্যযুগের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট শ্রেণীগুলিকে পশ্চাদ্ভূমিতে ঠেলে দিয়েছিল।

মুনাফা অর্জনের প্রয়াসে পুঁজিপতিরা উৎপাদন ও পণ্যবিপণন অবিরাম সম্প্রসারিত করছিল। নতুন শিল্প শাখা গড়ে উঠেছিল, সেগুণের জন্য স্থানীয় কাঁচামালরে সঙ্গে কেনা হচ্ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকার কাঁচামালও এবং তৈরি পণ্য শূদ্ধ দেশেই নয়, পরিভুক্ত হচ্ছিল সারা দুনিয়ায়। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় স্বাভাব্য ও আত্ম-জীবনধারণের স্থলবতী হয়েছিল জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্বতোমুখী যোগাযোগ এবং তাদের সর্বতোমুখী পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির দ্রুত উন্নতি, প্রযুক্তিগত প্রগতি এবং গণযোগাযোগের সদৃশপ্রসারী সুবিধাদির বিকাশের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বহু জাতিকে তার উৎপাদন প্রণালীতে জড়িয়ে আপন ভাবমূর্তি ও পছন্দসই একটি জগৎ সৃষ্টি করেছিল।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের গভীরতর সামাজিক বিভাজন ও উৎপাদনের বিশেষীকরণ উৎপাদনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হওয়া সহ উৎপাদন বৃহত্তর উদ্যোগসমূহে কেন্দ্রীভূত হয়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সামাজিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, উৎপাদনের ফলগুলি

উৎপাদনের উপায়ের মালিক পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করত। এটি সামাজিক উৎপাদন ও তার ফলের ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাতের মধ্যকার একটি অসঙ্গতি, পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি, যা ছিল ও রয়েছে এবং ওই সমাজব্যবস্থার যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধকে চিহ্নিত করেছে।

পুঁজিতন্ত্রের এই মূল অসঙ্গতি তীব্রতম রূপে দেখা দেয় অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটে, যা পর্যায়িকভাবে প্রবলতর শক্তিতে পুঁজিতন্ত্রকে কাঁপিয়ে তোলে, সমাজব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ লিখেছিলেন যে এইসব সংকট কেবল তৈরি পণ্যেরই নয়, ইতিমধ্যে সৃষ্ট উৎপাদনী শক্তির একটা বড় অংশের ধ্বংসের সঙ্গেও জড়িত থাকে। এই সংকট এক ধরনের সামাজিক মহামারী সৃষ্টি করে, যা পূর্ববর্তী যুগে অসম্ভব বিবেচিত হত, কেননা মহামারীটি বস্তুত অতি-উৎপাদনের।

পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি থেকে অন্যান্য বিরোধও উদ্ভূত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একক পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগে উৎপাদনের সুদক্ষ সংগঠন আর গোটা সমাজের নৈরাজ্যের মধ্যকার তীব্র অসঙ্গতি উল্লেখ্য। প্রতিটি উদ্যোগ ব্যক্তিগতভাবে কারখানা ও উদ্যোগের মালিক, পুঁজিপতির ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত। মুনাজার তাড়না ও নির্মম প্রতিযোগিতা প্রত্যেক পুঁজিপতিকে আপন উদ্যোগে কঠোর শৃঙ্খলা

প্রবর্তনায় এবং প্রতিটি ইউনিটের ফ্রিয়াকলাপ কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাধ্য করে। ইতিমধ্যে গোটা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আদিম শক্তির শাসন কায়েম হয়, কেননা সমাজটি তো ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক, অর্থাৎ এখানে গোটা সামাজিক উৎপাদনের সুস্বয়ং বিন্যাস সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক শিল্পোদ্যোগী নিজের চিন্তাভাবনা অনুসারে, প্রায়শই অন্ধভাবে পথ চলে। শূদ্ধভাবে বাজারের চাহিদা নির্ধারণক্ষম ব্যক্তিই সর্বোচ্চ মুনাফা পায় ও নিজের উৎপাদন বাড়ায়, আর চাহিদার শূদ্ধ প্রক্ষেপে ব্যর্থতার পরিণাম ব্যাপক লোকসান, কখনো ধ্বংস ও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন স্বতঃস্ফূর্ত ও এলোমেলো ভাবে বিকশিত হতে চায় এবং তাতে অর্থনীতির একক ক্ষেত্র ও শাখাগুলির বিকাশে অনিবার্য অসামঞ্জস্য দেখা দেয় আর ফলত বিপুল লোকসান, উৎপাদনের ধারায় মারাত্মক বিঘ্ন, অর্থনৈতিক সংকট ঘটে। এগুলি হল উৎপাদন ও পরিভোগের অনুপাতে বিপর্যয় ঘটানো কুফল। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় বিক্রয়ের পরিস্থিতির সঙ্গে উৎপাদনের পরিস্থিতির সন্নিপাত ঘটে না: মুনাফার বন্য তাড়নার ফল হিসাবে পুঁজি সঞ্চয়ন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এতটা বাড়িয়ে তোলে যে বাজার তা আত্তীকরণে ব্যর্থ হয়; প্রকৃত মজদুরির পরিসর মেহনতিদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সীমিত করে রাখে; পুঁজিপতিরা ব্যাপক জনসাধারণের পরিভোগকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমানোর প্রয়াস পায়

এবং সেজন্য উৎপাদনের তুলনায় মেহনতিদের আদায়কৃত চাহিদা (যা শ্রমিকরা বস্তুতই ক্রয় করতে পারে) অনেক মন্থরগতিতে বাড়ে। মার্কসের ভাষায়: 'সত্যিকার সকল সংকটের চূড়ান্ত হেতু সর্বদাই নিহিত থাকে দারিদ্র্য ও জনগণের সীমিত পরিভোগে।'* সংকট দেখা দেয় উৎপন্ন পণ্য বিক্রি না হওয়ার দরুন এবং এজন্য নয় যে জনগণের তা প্রয়োজন নেই, আসলে মেহনতিদের এগুলি ক্রয়ের ক্ষমতা থাকে না। কোটি কোটি মেহনতি মানুষ ভরপেটের বদলে কম খায়, কেননা 'অত্যধিক' রুটি উৎপন্ন হয়েছে; লোকে শীতে ভোগে, কেননা খনি থেকে 'অত্যধিক' কয়লা উঠেছে; কোটি কোটি নরনারীর অশেষ দারিদ্র্য সত্ত্বেও সংকটকালে ধ্বংস করে ফেলা হয় বিপুল পণ্যসম্ভার।

পুঞ্জিতন্ত্রে অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য ও অপরিহার্য। এই সংকট জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পুঞ্জিতন্ত্রের নিত্যসঙ্গী।

প্রথম শিল্পসংকট দেখা দিয়েছিল ইংলন্ডে ১৮২৫ সালে আর দু'নিয়াজোড়া শিল্পসংকট ১৮৪৭—১৮৪৮ সালের ঘটনা, তাতে জড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'মহামন্দা' নামে পরিচিত ১৯২৯ — ১৯৩৩ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ছিল এই শতকের সবচেয়ে বিধ্বংসী সংকটের অন্যতম; তাতে বাতিল বা ধ্বংস করা হয় — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১০০

* Karl Marx, *Capital*, Vol. III, p. 484.

ব্লাস্ট ফার্নেস, কেবল ১৯৩৩ সালেই ১ কোটি একর তুলা-ক্ষেত পুনঃচাষের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়; রেল-ইঞ্জিনে পোড়ান হয় গম; ব্রাজিলে ২ কোটি বস্তা কফি ও ডেনমার্ক ১ লক্ষ গোরু ধ্বংস করা হয়। সংকটকালে পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পোৎপাদন ৪০ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছিল এবং দুই দশক পিছিয়ে পড়েছিল।

১৯৭৪-১৯৭৫ সালের বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকটে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর প্রভাবের নিরিখে প্রায়শই ‘মহামন্দার’ সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে প্রায় একইসঙ্গে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। এতে একটি সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল: জিনিসপত্রের দামের অভূতপূর্ব সাধারণ উর্ধ্বগতি। এই অর্থনৈতিক সংকট জড়িত হয়ে পড়েছিল শক্তি ও কাঁচামাল সংকটের আকস্মিক প্রবলতম বিস্ফোরণের সঙ্গে, তাতে যুক্ত হয়েছিল পুঁজিতন্ত্রের বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংযোগের গোটা ব্যবস্থার এক নজিরবিহীন ভাঙন। কয়েক বছরের মধ্যে অরেকটি সংকটের অশুভ অপছায়ার আভাস পুনরায় দিগন্তে ফুটে উঠেছিল। অতি-উৎপাদনের ভয়ঙ্কর ছবি আরেকবার বাস্তব হয়ে উঠেছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব আরেকটি প্রবল সংকটে আলোড়িত হয়। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান দশকের শেষের দিকে, পরবর্তী দশকের গোড়ায় পশ্চিম দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কম্পনের নতুন শক্তিশালী বিস্ফোরণ দেখা দেবে।

ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে সংকট ও মন্দার পর্যায়িক আবৃত্তি ছাড়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সম্ভবপর নয়। দুটি অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যকালকে শিল্পচক্র বলা হয় এবং তা তার ধ্রুপদী রূপে চারটি পর্যায়ে গঠিত: সংকট, মন্দা, পুনরুত্থান ও উর্ধ্বগতি।

সংকট হল শিল্পচক্রের একটি পর্যায়, যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনরে অসঙ্গতিগুলি অত্যন্ত তীব্র ও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে: বিপুল পরিমাণ পণ্যের কোন চাহিদা থাকে না, উদ্যোগগুলি বিনষ্ট ও বন্ধ হয়ে যায়, উৎপাদন হ্রাস পায়, বেকারের সংখ্যা বাড়ে, মজুরি কমে, ইত্যাদি। সংকটের ঝড় দুর্বল ও ক্ষুদ্র পুঁজিগুলিকে উৎখাত করে, শক্তিশালী ও অধিকতর সুসজ্জিত উদ্যোগের জন্য বাজার খোলে, যেগুলি বাজারের পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পেরেছিল। মেহনতিরা, প্রথমত শ্রমিক শ্রেণীই হয় সংকটের সর্বাধিক কুফলের ভাগীদার। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের উপর বেকারির অভিশাপ নামে, তারা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়, যারা তখনো কাজে বহাল থাকে তারা দারুণভাবে শোষণিত হতে থাকে।

সংকট পর্যায় ক্রমে ক্রমে মন্দাকে পথ ছেড়ে দেয়, উৎপাদন তখন আর সংকুচিত হয় না, কিন্তু অর্থনীতিতে বন্ধাবস্থা বিরাজ করে। বেকারি ও মজুরি মোটামুটি সংকট পর্যায়ের অনুরূপ অবস্থায়ই থাকে, কালক্রমে পণ্যমজুত কমে আছে, ব্যবসায়ীরা শিল্পে নতুন ফরমাশ পাঠায়, তাতে সৃষ্টি হয় চক্রের পরবর্তী পর্যায় পুনরুত্থানে উত্তরণের পূর্বশর্ত।

পদ্মনরুথান পর্যায়ে সংকটকালে টিকে থাকা উদ্যোগগুলি নিজেদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদনী সরঞ্জামের আধুনিকীকরণ শুরুর করে, ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়ায়। উৎপাদের পরিমাণ সংকটের আগেকার পর্যায়ে পৌঁছয় ও অতঃপর তা অগ্রিম করে।

পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প প্রাক-সংকটকালের তুঙ্গাবস্থা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি পদ্মনরুথান পর্যায়ে থেকে চক্রের পরবর্তী পর্যায়ে, উর্ধ্বগতিতে উত্তীর্ণ হয়, যেখানে পুঁজিপতিরা পদ্নরায় উৎপাদন বাড়ায় ও পণ্যের প্রাচুর্যে বাজার ভরে তোলে। তেজী দর উৎপাদন বৃদ্ধি স্থিরিত করে এবং তা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধিকে ক্রমেই অতিক্রম করে এগোয়। এই পর্যায়েই অতি-উৎপাদন অদৃশ্যভাবে গড়ে উঠতে থাকে, যখন প্রয়োজনীয় ক্রেতার অভাবে ক্রমেই অধিক পরিমাণ পণ্যে ভাঁড়ার ভরে ওঠে। অর্থনীতির অভ্যন্তরে গুরুত্ব বিশিষ্ট বিকশিত হতে থাকে যখন পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি আরেকবার সংকটের দিকে এগোয়। এভাবেই গোটা চক্রের পদ্নরাবৃত্তি ঘটে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে উর্ধ্বমুখী সর্পিলা অগ্রগতির প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও তাতে পৌনঃপুনিক বিপর্যয় লেগেই থাকে। চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই বিচলনের এস্কেলস প্রদত্ত চিত্রকল্প বর্ণনাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: বন্ধাবস্থার পর্যায়ে 'বিপুল পরিমাণ উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদ পাইকারীভাবে বিনষ্ট ও ধ্বংস হয় যে-পর্যন্ত না পুঞ্জীভূত পণ্যসম্ভার শেষাবধি চুইয়ে বেরোয়,

অল্পবিস্তর মূল্য হারায়, যে-পর্যন্ত না উৎপাদন ও বিনিময় পুনরায় ধীরে ধীরে সচল হয়ে ওঠে। অল্পে অল্পে গতিবেগ বাড়ে। তারপর দুলকি চাল। শিল্পের দুলকি চাল হঠাৎ স্বচ্ছন্দ ধাবনের রূপলাভ করে, স্বচ্ছন্দ ধাবন অতঃপর রূপান্তরিত হয় শিল্প, বাণিজ্য, ঋণ ও ফটকা ব্যবসার নিখুঁত ধাবন প্রতিযোগিতার হঠকারী দ্রুত ধাবনে, যা পরিশেষে মরিবাঁচি ঝম্প দিয়ে শেষ গন্তব্যে পৌঁছয় যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল — একটি সংকটের গহবরে। এবং বার বার তারই পুনরাবৃত্তি।*

১৯৫০-র, বিশেষত ১৯৬০-র দশকে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনীতিকরা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সংকটমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এই দাবিও উচ্চারণ করেছিলেন যে তাঁরা ইলেক্ট্রনিক্‌স্, পারমাণবিক শক্তি ও স্বয়ংক্রিয়তা পরিচালিত পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির এক ‘ষাদু-কাপেট’ সহ এক ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, যা চলেছে অদ্যাবধি সকলের স্বপ্নাতীত এক দিগন্তের পানে। ‘ষাদু-কাপেট’ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বয়ে নিয়েছিল ঠিকই, তবে তা অঘোষিত সংকট ও একাধিক উৎক্ষেপের দিকেই।

সেজন্য আমরা দেখি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন তাঁর উঠা-নামা, উৎক্ষেপ ও নিম্নগতি সহ অত্যন্ত দ্রুতলয়ে

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 316.

বিকশিত হয়, এবং অর্থনৈতিক সংকট স্পষ্টতই দেখায় যে পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট উৎপাদনী শক্তি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোকে অতিক্রম করেছে, যা সমাজবিকাশের প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যমান উৎপাদনী শক্তির সাহায্যে আরও অনেক বেশি পণ্যোৎপাদন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব, তবে সেজন্য প্রয়োজন জমি, কলকারখানা, ব্যাংক ও পরিবহনের উপর মেহনতিদের দখল। পুঁজিতন্ত্রের বর্ধমান মূল অসঙ্গতি, উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পুঁজিতান্ত্রিক বহিরাবরণ ভেঙ্গে ফেলা ও সকল মানদ্বয়ের কল্যাণের জন্য উৎপাদনী শক্তিগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় সবটুকু জায়গা ছেড়ে দেয়াকে মানবজাতির পক্ষে অবশ্যপালনীয় করে তুলেছে।

১। পুঁজি সঞ্চয়ন ও বেকারবাহিনী গঠন

পুঁজিতন্ত্রের অনেকগুলি অসঙ্গতিই সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে।

পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন, সরল পুনরুৎপাদন নয়, যখন প্রতি বছর অভিন্ন আয়তনের উৎপাদন অব্যাহত থাকে। কীভাবে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন ঘটে? মজুরি-শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্যের একটা অংশ পুঁজিপতিরা তাদের ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহার করে, আর বাকিটা যায় অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ক্রয় ও বাড়তি

শ্রমশক্তি সংগ্রহে। এভাবে কার্যকর পুঁজির আয়তন বাড়ে ও তা সঞ্চিত হয়।

পুঁজি সঞ্চয়নের আয়তনের উপর কী কী উপাদান প্রভাব ফেলে?

সর্বপ্রথম মেহনতিদের শোষণের একটা মাত্রা থাকে: তাদের শোষণের মাত্রা যতবেশি হয়, উদ্ভূত-মূল্যের উৎপাদনও ততই বেশি হয় এবং এইসঙ্গে পুঁজি সঞ্চয়নের সুবিধাও আরও বিস্তৃত হয়। উদ্ভূত-মূল্যের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে মজদুরি কমানোর প্রয়াস পায়।

পুঁজি সঞ্চয়নের আয়তনে বর্ধমান শ্রমের উৎপাদনশীলতার প্রভাব থাকে। শ্রমিকদের জন্য পরিভোগসামগ্রী প্রস্তুতকারক শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে তাতে শ্রমশক্তির মূল্যহ্রাসের প্রবণতা দেখা দেয়, অভিন্ন পরিসরের অস্থির পুঁজি অধিকতর পরিমাণ জীবন্ত শ্রমকে সঞ্চিত করে তোলে ও তাই বৃহত্তর পরিমাণ উদ্ভূত-মূল্য নিষ্কাশন করে। অধিকন্তু, বর্ধমান শ্রমের উৎপাদনশীলতা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দাম কমায়, তাতে অভিন্ন আয়তনের স্থির পুঁজি দিয়ে অধিক সংখ্যক যন্ত্রপাতি অধিকতর দক্ষতা সহকারে ব্যবহার করা যায়।

আগাম-দেওয়া পুঁজির পরিসরও সঞ্চয়নের আয়তনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, কেননা এটা যুক্তিসঙ্গত যে অভিন্ন মাত্রার শোষণে উদ্ভূত-মূল্যের মোট পরিমাণ নির্ভর করে একইসঙ্গে শোষিত শ্রমিকের সংখ্যার উপর, এবং

শ্রমিকের সংখ্যা — প্রধানত কার্যকর পুঁজির আয়তন এবং স্থির ও অস্থির পুঁজিতে তার বিভাজনের উপর।

পুঁজি সঞ্চয়নের সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয় (অর্থাৎ স্থির পুঁজি বৃদ্ধি পায়) এবং এইসঙ্গে বাড়তি শ্রমশক্তি সংগ্রহের খরচাও (অর্থাৎ অস্থির পুঁজিও বৃদ্ধি পায়)। কিন্তু পুঁজির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে স্থির পুঁজির অংশভাগ অস্থির পুঁজির অংশভাগ অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে চায়, কেননা পুঁজিপতিরা তাদের উদ্যোগে নতুন ও অধিকতর উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি বসায় বাড়তি মুনাবার তাড়না ও অন্যান্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্ররোচনায়। আধুনিকীকৃত যন্ত্রপাতির কল্যাণে একক উৎপাদন-ব্যয় গড় পরিমাণের নিচে কমান যায় এবং তাতে বাড়তি আয় হয়। অধিকন্তু, তা পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান মজবুতও সহায়তা যোগায়। অধিকতর উৎপাদনশীল মেশিন ব্যবহারে কম সংখ্যক শ্রমিক খাটিয়ে অভিন্ন বা অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা যায় এবং অনেক উদ্যোগের শ্রমিকেরই আপন অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে আধুনিকীকরণ আসলে চাকুরি খোয়ানোর সামিল।

সেজন্য পুঁজি সঞ্চয়নের ফলে অস্থির পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজি দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং যেহেতু অস্থির পুঁজির আয়তনের উপরই চাকুরিরত কর্মীর সংখ্যা নির্ভরশীল, সেজন্য এর অংশভাগ কমে গেলে বহু শ্রমিক অনিবার্যভাবেই ‘ফালতু’ ঘোষিত হয়।

ইদানীং তা খুবই স্পষ্ট। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে নতুন পুঁজিলগ্নির একটা বড় অংশই রোবট ও নমনীয় উৎপাদন প্রণালীর মতো শ্রমসাপ্রয়ী প্রযুক্তি বসানোর জন্য ব্যয়িত হয়, সর্বোপরি শ্রমশক্তি ও মজদুরির জন্য খরচা সাশ্রয় করে। পুঁজিপতিরা যথানিয়মে পুরনো উদ্যোগ আধুনিকীকরণ ও উচ্চ-প্রযুক্তির উৎপাদনের সঙ্গে সেগদলিকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস পায়, কিন্তু নতুন উদ্যোগ নির্মাণ ও নতুন চাকুরি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকে।

অস্থির পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির দ্রুততর বৃদ্ধির দরুন শ্রমশক্তির চাহিদা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায় ও 'ফালতু' শ্রমশক্তি দেখা দেয়, যার সরলার্থ বেকারি, যাতে গড়ে ওঠে 'শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী'। সন্দেহ নেই, এই 'ফালতু' মেহনতি জনতা পুঁজি সঞ্চারেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদক — কারিগর ও কৃষক, যারা প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয় — তারাও ওই বেকারদের দল ভারি করে।

এভাবে গঠিত 'শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনী' কেবল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ফল নয়, তার বিকাশের একটি শর্তও। লেনিন বলেছিলেন: সেটা 'পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সহগামী বিধায় পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ, যা ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব হত।'*

* V. I. Lenin, 'A Characterisation of Economic Romanticism', *Collected Works*, Vol. 2, 1973, p. 181.

একবার বাণিজ্যিক কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত হলে পুঁজিপতিরা নতুন শ্রমশক্তির জন্য ওই শ্রমিকবাহিনীর দ্বারস্থ হয়, নতুন সংকট সৃষ্টি হলে তারা তাদের আবার পথে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনীর অস্তিত্বের দরদুন কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য ও শ্রম-নিবিড়তা বাড়িয়ে, মজদুরি কমিয়ে পুঁজিপতিরা শোষণ তীব্রতর করে তোলে। ‘ফালতু’ শ্রমশক্তির একটি ভাণ্ডারের অস্তিত্ব পুঁজিপতির জন্য সুবিধাজনক, কেননা তার ইচ্ছানুযায়ী শর্তে কাজ করতে ইচ্ছুক নরনারী পুঁজিপতির খুবই প্রয়োজন। পুঁজিপতিরা চায় যে শ্রমিকরা বেকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করুক, যাতে তারা আরও বশ্য ও কম দাবিদার হতে পারে।

শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনীর গঠন ও বৃদ্ধি পুঁজিতন্ত্রের মজ্জাগত জনসংখ্যা সংক্রান্ত একটি বিশিষ্ট নিয়ম। এই নিয়মের অধীনেই মেহনতি জনগণ পুঁজি সঞ্চয়নের জন্য কাজ করে এবং এভাবে বর্ধমান আয়তনসেই উপায়গুলি উৎপাদন করে যাতে অপেক্ষাকৃত উন্নত জনসংখ্যা সৃষ্টি হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে আপেক্ষিক জনাধিক্য তিনটি মূল রূপ পরিগ্রহ করে: চলতি, সৃষ্টি ও নিশ্চেষ্ট।

জনাধিক্যের চলতি রূপে থাকে সেইসব শ্রমিক যারা সাময়িকভাবে চাকুরিচ্যুত, যারা পালানুগমে উৎপাদনে যুক্ত হয় ও পুনরায় চাকুরি হারায়, যখন কোন-না-কোন উদ্যোগে উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়, নতুন কলকারখানা খোলে কিংবা উৎপাদন কমান, নতুন

যন্ত্রপাতি বসান, কলকারখানা বন্ধ করে দেখা হয়।
 সর্বপ্রথম বয়স্কতর ও বিদেশী শ্রমিকরাই বেকার হয়ে
 পড়ে, কেননা পুঁজিপতিরা সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনী
 থেকে জোয়ান ও শক্তিশালী শ্রমিকদেরই বাছাই
 করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য, স্কুল-স্নাতক
 ও অন্যান্য অল্পবয়সীদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা উঁচু
 স্তরে পৌঁছেছে।

সুদৃষ্ট ধরনের জনাধিক্য গ্রামীণ এলাকাগুলির
 প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, যেজন্য তা প্রায়ই কৃষিগত
 জনাধিক্য নামে অভিহিত। এতে থাকে গ্রামাঞ্চলে
 বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক নরনারী যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের
 কোন সুব্যবস্থা নেই। সুদৃষ্ট ধরনের জনাধিক্যের একটি
 স্বকীয় বৈশিষ্ট্য: কৃষক নিজ জমিতে দৈনিক ১২
 ঘণ্টা বা ততোধিক সময় কাজ করেও সেই শ্রমের জন্য
 সামান্যই প্রতিদান পায়। সে গ্রামের মাটি আঁকড়েই
 পড়ে থাকে ও অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায়।
 কিন্তু এভাবে দীর্ঘকাল চলে না: সে একজন সম্ভাব্য
 মজদুর-শ্রমিক। পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠলে কোন
 শহরে সে চাকুরির খোঁজে আসে। উন্নয়নশীল দেশে,
 দৃষ্টান্ত হিসাবে আফ্রিকায়, ৫০ শতাংশ, কোন কোন
 ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত গ্রামীণ মজদুর-জনতা
 অতিরিক্ত শ্রমশক্তির সম্পদ গঠন করে। এশিয়া ও
 লাতিন অমেরিকার অনেকগুলি দেশে কৃষিগত
 জনাধিক্য বিপুল আকার ধারণ করেছে।

নিশ্চেষ্ট জনাধিক্যে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর সেই
 অংশটি যারা খুবই অনিয়মিতভাবে কাজ করার সুযোগ

পায় ও দীর্ঘকাল বেকার থাকতে বাধ্য হয়। এরা হল কর্মক্ষম বয়সীদের অন্তর্গত সেইসব লোক যারা দীর্ঘকাল বেকার থাকে, দান-খয়রাতি দৌলতে বাঁচে এবং এইসঙ্গে পঙ্গু, রুগ্ণ ও বৃদ্ধ।

বেকারবাহিনী পুঞ্জিতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। পুঞ্জিতন্ত্রের পথবর্তী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেকারসংখ্যা বহু কোটি। এমনকি উন্নততম পুঞ্জিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহেও বেকারি একটি সামাজিক অন্যায়: ১৯৬০ সালে উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারীভাবে ঘোষিত সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ এবং অতঃপর সংখ্যাটি যথাক্রমে — ১৯৭০-র মধ্যদশকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৮০ সালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৮৫ সালে ৩ কোটি অতিক্রম করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল বেকার লাইনে দাঁড়ালে তা দেশের একদিকের আটলান্টিক থেকে অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছবে।

বেকারি একটি মারাত্মক সামাজিক অকল্যাণ এবং কোন পরিসংখ্যানেই বেকারদের পুরো কাহিনী বর্ণনীয় নয়। বেকারি শুধু দারিদ্র্য বা অর্থকষ্ট নয়। বেকারি আসলে মারাত্মক ও অপমানকর দুরবস্থার নিপতিত হওয়ার সাক্ষ্য, কেননা তা সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশ্রয় থেকে নির্বাসনের নামান্তর। বেকারি খোদ মানবিক মর্যাদাবোধ পদদলিত করে মানুষকে ক্লীবহে পর্যবসিত করে। কর্মহীন মানুষের দুঃখকষ্ট ভয়াবহ: তারা আরেকটি চাকুরি না পাওয়ার

দুর্ভাবনায় নিরন্তর সন্ত্রস্ত থাকে, শ্রমিক নিয়োগকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ায়, বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়, তাদের বিষয়-আসয় নিলামে ওঠে, কিস্তিশোধের শর্তে আনা জিনিসপত্র ফিরিয়ে নেওয়া হয়, অপরিহার্য চাহিদাগুলি মেটানও অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং কখন কখন ক্ষুধা ও আশ্রয়ের অভাবে তারা আত্মহত্যা করে। বেকারি নানা মানসিক সংকট, স্নায়ুবৈকল্য ও মানসিক বিকৃতির উৎস, তাতে মানুষ নেশাখোর হয়ে ওঠে, পরিবার ভেঙ্গে যায়।

২। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চারের সাধারণ নিয়ম

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এক মেরুতে সম্পদ, বিলাস ও অবসর বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে শ্রমজীবী মানুষের দঃখ-দুর্দশা, প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ও বেকারি বাড়ায় এবং মেহনতিদের অবস্থার অবনতি ঘটায়। পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চারের এই সাধারণ নিয়মের আবিষ্কারক ও রূপকার কার্ল মার্কস বলেছিলেন: 'যত বৃদ্ধি পায় সামাজিক সম্পদ, কার্যকর পুঁজি, তার বৃদ্ধির পরিসর ও শক্তি এবং ফলত প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত সংখ্যা ও তার শ্রমের উৎপাদনশীলতা, ততই বৃদ্ধি পায় শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী... কিন্তু সক্রিয় শ্রমিকবাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত বাহিনীর আয়তন যতই বেশি হয়, ততই বেশি হয় স্থায়ী জনাধিক্যের আয়তন, যাদের দুর্দশা শ্রম মোচড়ানোর সঙ্গে ব্যস্ত-আনুপাতিক হয়ে থাকে। পরিশেষে শ্রমিক

শ্রেণীর নিঃস্বতম স্তর ও শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী
যত বিস্তৃত হয় ততই বৃদ্ধি পায় সরকারীভাবে স্বীকৃত
নিঃস্বতা। এটাই পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের অন্যপেক্ষিক
সাধারণ নিয়ম।*

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়মটি
পুঁজিতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম, উদ্ভূত-মূল্যের
নিয়মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও তন্ম্বারা নির্ধারিত,
কেননা উদ্ভূত-মূল্য ও মুনীফা বৃদ্ধির তাড়নার
ফলশ্রুতিতেই বৃহত্তর পুঁজি সঞ্চয়ন ও বৃজ্জোয়ার
দৌলতবৃদ্ধি ঘটে। পুঁজিপতিদের হাতে যত বেশি
সম্পদ সঞ্চিত হতে থাকে বেকারের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি
পায়, উৎপাদনে নিযুক্তদের শোষণও ততই তীব্রতর
হয়ে ওঠে, প্রলেতারিয়েতের অবস্থারও ততই অবনতি
ঘটে।

বৃজ্জোয়ারদের কাছে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ বিপুল।
দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্রিটেনের বাসিন্দাদের ১ শতাংশের
হাতে দেশের ব্যক্তিগত সম্পদের ২৫ শতাংশ আর
যথাক্রমে ৫ শতাংশের হাতে রয়েছে ৫০ শতাংশ;
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে জাতীয়
সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীভূত; মার্কিন কোটিপতি
ভান্ডেরবিলেটের একটি প্রাসাদের কক্ষসংখ্যা ২৫০ ও
দাম ৬ কোটি ডলার; অনেক পুঁজিপতিরই আছে
নিজস্ব ব্যক্তিগত বিমান, সমুদ্রগামী ইয়ট, মহাঘ

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, p. 603.

মোটরগাড়ির বহর, চিত্রোপম স্বাস্থ্যকার অঞ্চলে একাধিক
সুদূরম্য বাসভবন।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অন্য মেরুতে থাকে
প্রলেতারিয়েত, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে
আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক ভাবে যাদের অবস্থার অবনতি
ঘটতে থাকে।

বুর্জোয়ার অবস্থার তুলনায় প্রলেতারিয়েতের অবস্থায়
আপেক্ষিক অবনতির প্রবণতা প্রকটিত হয়। মার্কস
বলেছিলেন: 'শ্রমিকদের অবস্থা... সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির,
অর্থাৎ পুঁজি সঞ্চয়নের অভিন্ন অনুপাতে আপেক্ষিক-
ভাবে খারাপ হতে থাকে।'* জাতীয় আয়ে, গোটা
সামাজিক উৎপাদে ও জাতীয় সম্পদে শ্রমিকদের
সংকোচমান অংশভাগ হল প্রলেতারিয়েতের আপেক্ষিক
অবনতিশীল অবস্থার একটি সূচক, যা পুঁজিপতিদের
পক্ষে ও শ্রমিক শ্রেণীর বিপক্ষে মজদুরি ও মুন্যফার
পরিবর্তমান অনুপাতের মধ্যেও প্রকটিত হয়। তাই
দেখা যায়, ১৯৭০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায়
১৯৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
শ্রমিকের প্রকৃত মজদুরি প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে,
অথচ কর্পোরেশনগুলির করশোধের পরবর্তী প্রকৃত
মুন্যফা বেড়েছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত।

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম মেহনতিদের
অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি ঘটানোর একটি প্রবণতাও

* Karl Marx, *Theories of Surplus-Value*, Part
III, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 335.

সৃষ্টি করে এবং তা 'কার্যিক দারিদ্র্য' ও 'সামাজিক অর্থে দারিদ্র্য' বৃদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করে।

'কার্যিক দারিদ্র্য' বলতে বোঝায় ব্যাপক জনসাধারণের অপদৃষ্টি ও বদভুক্ষা, নিকৃষ্ট আবাসন পরিস্থিতি, পোশাক ও গৃহস্থালি সামগ্রীর প্রাথমিক চাহিদা পূরণের অতি সীমিত সম্ভাবনা এবং আত্যন্তিক মৃত্যুহার। 'দুই নগরের কাহিনী' উপন্যাসে চার্লস ডিকেন্স শতাব্দীকাল আগে লিখেছিলেন যে, শ্রমিকরা চরম দারিদ্র্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, ছেঁড়া পোশাকে শীতে কাঁপত, শিশুদের মুখে বার্ষিকের ছাপ পড়েছিল, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সকলের মুখেই ছিল বদভুক্ষার সূক্ষ্মপট চিহ্ন। এমনকি আজও পুর্জিতান্ত্রিক দেশে বহু লোক যথার্থই এক টুকরো রুটির প্রত্যাশী। উন্নয়নশীল দেশে ৪০ কোটির বেশি নরনারী প্রাথমিকতম চাহিদাগুলি পূরণে ব্যর্থ হয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। আগামী শতকের শুরুরূপে সংখ্যাটি ১.২ বিলিয়নে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। দেড় কোটি শিশু সহ প্রায় ৫ কোটি মানুষ প্রতি বছর তৃতীয় বিশ্বে অনাহারে মারা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ৭০—৮০ কোটি মানুষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর, ১৫০ কোটি মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

পুর্জিতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনী, বেকারবাহিনীর বিস্তার ও প্রকৃত মজুরি হ্রাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঘরভাড়া ও চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যেও

তা লক্ষণীয়। শ্রমিকরা অধিক শ্রমে বাধ্য হয়, শিল্প-দুর্ঘটনার শিকার ও পেশাগত রোগগ্রস্তদের সংখ্যা বাড়ে এবং এই সবগুলিতেই তাদের প্রাণশক্তির নবায়নহীন ঘাটতি ঘটে। শ্রমিকদের আত্যন্তিক ক্লান্তিজর্জরিত কারণে সবগুলি পুর্নজিতান্দ্রিক দেশেই এখন কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়াচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা ৫০ লক্ষ, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ২০ লক্ষ, ফ্রান্স ও ইতালির প্রত্যেকটিতে ১০ লক্ষাধিক। এই তো সেই রক্তমূল্য, যা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে পুর্নজিপতির জন্য মুনোফা বাড়াতে হয়।

অত্যধিক ঘরভাড়ার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর বহু পরিবার অননুযায়সের অযোগ্য জায়গায় — পাতালকুঠরি, চিলেকোঠা ও শহরের বস্তিতে — মাথা গুঁজতে বাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শহরগুলির মোট বাসস্থানের এক-পঞ্চমাংশ বস্তি আর এগুলি বাণিজ্যিক মহল্লার চারপাশে ক্যানসারের মতো কেবল বেড়েই চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শহরগুলির ২৫-৩০ শতাংশ বাসিন্দা থাকে ধসা বাড়িঘরে। ব্রিটেনের বাড়িগুলি সাধারণত নিম্ন তাপমাত্রার উপযোগী হিসাবে তৈরি নয় এবং অধিকাংশেই তাপনব্যবস্থা অননুপস্থিত। 'মনিং স্টার' পত্রিকার মতে প্রতি বছর ব্রিটেনে প্রায় ৪০ হাজার নরনারী (অধিকাংশই ৬৫ বছর বা ততোধিক বয়সী) শীতে জমে প্রাণ হারায়। পুর্নজিতান্দ্রিক বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধতম দেশ ব্রিটেনের পক্ষে এমন করুণ ঘটনা একটি কলঙ্ক বৈকি, অথচ

তার সরকার জনগণের আবাসন সহ অনেকগুলি সামাজিক সেবামূলক খাত থেকে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছে। ‘সামাজিক অর্থে দারিদ্র্য’ বলতে বোঝায়: চাহিদার বর্ধমান স্তর ও মেহনতিদের অপরিহার্য সামগ্রীর আসল পরিভোগের স্তরের মধ্যকার বর্ধমান অসামঞ্জস্য।

এমনকি, সমৃদ্ধতম পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত দারিদ্র্যসীমার নিচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরা জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (সাধারণ বাজার) দেশগুলির ও কোর্ট লোক সরকারীভাবে স্বীকৃত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়মের সক্রিয়তা অনিবার্যভাবে শ্রেণী-শক্তিগুলির মেরুবর্তিতায় সহায়তা যোগায় এবং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীগত ও সামাজিক বিরোধকে অপরিহার্যভাবে তীব্রতর করে তোলে। এক মেরুতে আমরা দেখি শোষকদের, উদ্ধৃত-মূল্য আত্মসাৎ যাদের সম্বল এবং মুনামা বাড়ানোর জন্য যেকোন দুষ্কর্মে তৎপর, আর অন্য মেরুতে শোষিত শ্রেণীগুলি, যাদের পারিশ্রমিকহীন শ্রম, ঘাম ও অশ্রুতে শোষকদের সম্পদ ও উপার্জন পুঞ্জীভূত হয়। শোষকরা সংখ্যালঘু আর মেহনতিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের স্বার্থদ্বন্দ্ব মীমাংসাতীত ও তাদের সংঘাত অনিবার্য।

৩। শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সামাজিক কাঠামো এক বিচিত্র জোড়াতালি। প্রধান বৈরী শ্রেণীসমূহ — বুদ্ধিজীবি ও প্রলোভিতারিয়েতের পাশাপাশি আমরা দেখি জমিদার, আপন খামারে কর্মরত কৃষক ও জনসাধারণের অন্যান্য স্তর। এইসব শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন একক দলও রয়েছে। তাই বুদ্ধিজীবীর মধ্যে থাকে বড় ও ছোট পুঁজিপতি, প্রথমোক্তরা বিশাল উদ্যোগ, মহাবিপণী ও ব্যাংকের মালিক, আর শেষোক্তরা ছোটখাটো ব্যবসায়ী, জনকয়েক ক্ষেত্রে মজদুর খাটানোর মতো খামারমালিক, মেরামতি ও অন্যান্য কর্মশালার অধিকারী। বুদ্ধিজীবী, যারাও অসমসত্ত্ব, তারও একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক বর্গ — মানসিক পেশাজীবী মানুষ, অর্থাৎ উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃৎকৌশলী, মেকানিক, ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশটিই পুঁজিপতিদের বেতনভুক কর্মী, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকৌশলীরা।

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাগত শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার গুরুগত সংস্থিতির পরিবর্তনও ঘটে, শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নত হয় এবং জীবনধারা ও মননশীল অভীষ্ট বদলায়। আধুনিক মজদুর-শ্রমিকরা ১৯ শতকের শেষের প্রলোভিতারিয়েত থেকে স্পষ্টতই পৃথক।

কোন কোন উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছুর তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক শ্রেণী যথারূপে

এখন ‘বিলীয়মান’, সমাজের অন্যান্য স্তরে ‘দ্রবীভূত’। মজদুর ও বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়র, বিজ্ঞানী, কৃত্যক ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীর পর্যাপ্ত সংখ্যাবৃদ্ধিই এক্ষেত্রে মূল যুক্তি। কিন্তু, আসলে তা মজদুর-শ্রমিক শ্রেণীর বিলুপ্তির কোন সূচক নয়। এটা শুধু এটুকুই বোঝায়, যে পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রোতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে : ‘প্রলেতারিয়েত’ নামের প্রত্যয়টি এখন আরও সম্প্রসারিত।

আধুনিক প্রলেতারিয়েত কেবল শিল্পের কর্মশালার মজদুর আর ক্ষেতমজদুরদেরই অন্তর্ভুক্ত করে না, পুঁজিপতিদের জন্য কর্মরত বেতনভোগী ইঞ্জিনিয়র ও কৃৎকৌশলীদের সর্বস্তরের সকলেই এই বর্গভুক্ত। তারাও আপন শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রয় করে ও তাদের জন্য উদ্ধৃত-মূল্য উৎপাদন করে। মজদুর ও বেতনভোগী শ্রমিকদের মধ্যে আছে অফিস ও বাণিজ্যসংস্থার নিম্ন ও মধ্যস্তরের কর্মচারীরাও। সুতরাং আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী একটি বহুস্তর সামাজিক সত্তা, যার জটিল গড়ন ও ব্যাপকতর সামাজিক ভিত্তি ‘বিলুপ্তির’ বদলে তার অন্তর্হীন বিকাশকেই কেবল প্রতিপাদন করে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তাঁর অসঙ্গতিতে জীর্ণ, কেননা এখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগড়ালির স্বার্থ ও অভীষ্ট পরস্পর থেকে চিহ্নিতভাবে পৃথক, কখনো-বা পরস্পরবিরোধীও। পুঁজিপতিরা এমন একটি ব্যবস্থা চালু রাখতে চায় যেখানে মজদুর-

শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে মুনাকালাভ সম্ভব, আর প্রলেতারিয়েত নিজের দিক থেকে এই ধরনের ব্যবস্থা ধ্বংসের, মজদুর-দাসত্ব অবসানের পক্ষপাতী। একক পণ্যোৎপাদক ও পেটি বর্জোয়া বস্তুত বৃহৎ পুঁজির প্রাধান্যের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা এখন ব্যাপক সংখ্যায় তারা ধ্বংস হচ্ছে এবং এই ধরনের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ এখন পুঁজিপতি শ্রেণীর শিল্প ও ফিনান্স কুলীনদের স্বার্থের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বলিপ্ত, যাদের শোষণের শিকার আজ সকল শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী।

প্রলেতারিয়েত ও বর্জোয়ার মধ্যকার অসঙ্গতি হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাদের স্বার্থগর্ভালি সরাসর পরস্পরবিরোধী এবং এজন্যই তাদের সম্পর্ক তীব্র সংগ্রামের রূপলাভ করে। বর্জোয়া সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর বণ্ডিত অবস্থা, নির্যাতন ও অপমান ভোগ তাদের শ্রেণী-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। আধুনিক প্রলেতারিয়েত একটি সংগ্রামী শ্রেণী, সে নিজ স্বার্থের জন্য পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এখন অধিকতর সতেজ ও সুসংগঠিত। শ্রমিক শ্রেণীই বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গোটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান চালিকা ও নিয়োজক শক্তি।

শ্রমিক অসন্তোষের যেকোন অভিব্যক্তি দমনের জন্য বর্জোয়া সম্ভাব্য প্রত্যেকটি উপায়ই কাজে লাগায়:

পদলিখ ও সৈন্যবাহিনী তলব, আদালত ও জেলখানার সহায়তা। আগেকার দিনে আন্দোলনরত বা দাবিদাওয়া উত্থাপনকারী শ্রমিকদের গদলি করা বা ফাঁসিতে ঝুলান হত এবং এমনকি আজও পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশে প্রায়শই এগদলির পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে ইদানীং অধিকতর ‘মানবিক’ ব্যবস্থাই প্রধানত গৃহীত হয়ে থাকে : প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করা, ব্যাপক পদলিখী হামলা, ‘মোটা অঙ্কের জরিমানা ও জেল-খাটান, ‘কাল তালিকা’ তৈরি ও শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে একক সন্দ্রাস। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটে না। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-সমঝোতা অসম্ভব এবং প্রতিটি পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশ আজ দুই দেশে বিভক্ত : একটির বাসিন্দারা দাতা আর অন্যটির অধিবাসীরা গ্রহিতা।

পুঞ্জিপতিদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম পুঞ্জিতান্ত্রিক সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ধরন হল অর্থনৈতিক সংগ্রাম। চাকুরির জন্য, বরখাস্তের বিরুদ্ধে, কাজের উন্নততর পরিস্থিতি ও অধিক মজুরির লক্ষ্যে তা পরিচালিত। অর্থনৈতিক ধর্মঘট হল আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা সক্রিয় শ্রেণী-সংগ্রামে জড়িত হয়। ধর্মঘট একক উদ্যোগ বা পুরো শিল্পে, এবং জাতীয় ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে সারা দেশে সংঘটিত হতে পারে।

একঘণ্টা, একদিন ও অনেক দিন ধর্মঘটের রেওয়াজ আছে। কোন কোন দেশে, যেমন জাপানে শ্রমিক শ্রেণীর

‘বাসন্তী’ ও ‘হৈমন্তী’ আন্দোলন ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এগুর্দলিতে থাকে নানা শিল্পের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। বড় বড় কর্পোরেশনে অনেক সময় সকল শ্রমিক ধর্মঘট করে না, করে শুধু ‘মূল উদ্যোগের’ শ্রমিকরা, যেখানে অন্যান্য কর্মশালা থেকে আনীত যন্ত্রাংশ পরিশেষে সংযোজিত হয়। এই ধরনের ধর্মঘট গোটা কর্পোরেশনকেই অনেকটা অচল করে দেয় এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য উদ্যোগের শ্রমিকদের বৈষয়িক সাহায্য পেলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোন কোন ধর্মঘট ‘পর্যায়িক’, তাতে প্রথমে ধর্মঘট শুরুর করে একপ্রস্ত কর্মবিভাগ বা কারখানা, এবং ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়ানোর জন্য যোগ দেয় অন্যান্যরা। ছুটিয়ারি বা প্রদর্শনমূলক ধর্মঘটের রেওয়াজও আছে। ধর্মঘট চলাকালে ধর্মঘটীরা ধর্মঘটভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে উদ্যোগের চারদিকে প্রায়ই পিকেটের ব্যবস্থা করে।

সব শিল্পোন্নত দেশে ১৯৭০-র মধ্যদশক ও ১৯৮০-র গোড়ার দিকের অর্থনৈতিক সংকট, অত্যুচ্চ মাত্রার বেকারি, মদ্রাস্থিতি ও ফলত জীবনযাত্রার মারাত্মক ব্যয়বৃদ্ধি এবং বর্ধমান শ্রমিকশোষণের ফলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের একটি নতুন ও শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সংগ্রামটি মূলত পরিচালিত হয়েছিল কারখানা বন্ধ করার ও কর্মরত লোকদের ব্যাপক বরখাস্তের বিরুদ্ধে।

বরখাস্তের আশঙ্কা বা বরখাস্তের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গত কয়েক বছরে বস্তুত প্রায় সবগুর্দলি

পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আন্দোলন ব্যাপকতম হয়ে উঠেছে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে: ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ইতালিতে।

ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরাই সর্বাধিক উদ্যমে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রলোভিতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ ঘটানোর জন্য যথাসাধ্য করে ও তাদের স্বার্থের স্বপক্ষে দাঁড়ায়।

শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত ও সংঘবদ্ধ হওয়ার শর্তেই শৃঙ্খল প্রলোভিতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম সফল হতে পারে, কিন্তু কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নের সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে নানা অজুহাতে খুবই ধীরে ধীরে এগোয়। এটা বৃহৎ পুঁজির পক্ষে যথার্থই সুবিধাজনক, যা ট্রেড ইউনিয়নকে 'পোষ মানাতে' ইচ্ছুক, ট্রেড-ইউনিয়নের অধিকার ও স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করা এবং সম্ভাব্য সর্বতোভাবে ট্রেড ইউনিয়নের শরিকদের সংখ্যা কমানোর নীতি অনুসরণে কৃতসংকল্প।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামও চালায়। দু'টি প্রায়শই পরস্পর বিজড়িত। মেহনতিদের ব্যাপক অর্থনৈতিক আন্দোলন প্রায়শই খোদ পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী ধরনের একটি রাজনৈতিক চারিত্র্য পরিগ্রহ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন, প্রথমত শ্রমিক শ্রেণীর

রাজনৈতিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেশজোড়া রাজনৈতিক প্রচার ও সমাবেশ অনুষ্ঠান করে, স্থানীয় ও অন্যান্য নির্বাচনে শরিক হয়, অস্বপ্রতিযোগিতা ও সমরবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি দৃঢ়করণের পক্ষে মেহনতিদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগোয়।

শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শগত সংগ্রাম হল ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনার সংগ্রাম, যে ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনায় প্রতিফলিত হয় বুদ্ধিজীবীর ভাবাদর্শগত প্রভাব থেকে পুরোপুরি উত্তরণের এবং পূরনো দুনিয়ার বন্ধমূল ধারণা, কুসংস্কার ও অভ্যাস থেকে শ্রমিকদের মুক্তকরণের লক্ষ্যমুখী প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীস্বার্থ।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলিই শ্রমিকদের অধিকারের জন্য সর্বাপেক্ষা অটল সংগ্রামী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক ‘কমিউনিস্ট লীগ’, প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেহনতি মানুষের সংঘ — প্রথম আন্তর্জাতিক, এবং পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে লেনিনের স্থাপিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে অতীব তাৎপর্যবহ।

শ্রমিক শ্রেণীর নিমিত্তে উৎসর্গিত কমিউনিস্ট ও

শ্রমিক পার্টি'গুলি শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামীদের প্রথম সারিতে অবস্থিত। কোন কোন রাষ্ট্রে তারা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি। ফ্রান্স ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি'গুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট পায় ও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করে। অ-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টি'গুলির প্রার্থীদের এখন ৪ কোটির বেশি লোকে ভোট দেয়। ২৫টি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বিধানিক সংস্থাগুলিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি'গুলির সদস্যরা রয়েছেন। প্রত্যেক পর্যায়ে পৌঁছা সংস্থাগুলিতে নির্বাচিত হন হাজার হাজার কমিউনিস্ট। ট্রেড ইউনিয়ন, যুব সংগঠন ও অন্যান্য জনসংগঠনে কমিউনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি'গুলির মতে আজকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য: প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেঙ্গে দেয়ার যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং সামরিক উন্মত্ততা উসকানোর বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়ার সঙ্গে দীর্ঘ ও অটল লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। কমিউনিস্ট পার্টি'গুলি মেহনতিদের মৌলিক স্বার্থের সংগ্রামে শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য ও বৃহৎ পুঁজি আধিপত্যের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে তাদের

ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের শেষলক্ষ্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের রূপান্তর সাধনের কথা বলে।

ব্যাপক গণতান্ত্রিক জোট গঠনে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে কাজ করে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াস পায়: শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেইসব মেহনতি স্তরকে রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনা, যারা নানা কারণে আজও সক্রিয় শ্রেণী-সংগ্রামের বাইরে। কোন কোন দেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় কমিউনিস্টদের যোগদানের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং ঠিক তাই রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠনের উদ্যোগে তাদের কৌশলগত ধারাকে পূর্বনির্ধারিত করে।

কমিউনিস্ট পার্টিগণ সাকল গণতান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়াকলাপের একটি ব্যাপক কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা শ্রমিক শ্রেণী ও তার সংগঠনগুলির অবস্থান মজবুত করতে চায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সাকল প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তিগুলি নিয়ে একটি ঐক্যজোট গঠনের প্রয়াস পায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে — গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচিতে থাকে মেহনতিদের সামাজিক অধিকার ও অর্জনগুলি রক্ষার কর্মোদ্যোগ সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে — অস্বপ্রতিযোগিতা বন্ধ ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি অক্লান্ত শ্রেণী-সংগ্রামে আহুত প্রলেতারিয়েতের অর্জনগুলি রক্ষা ও বৃদ্ধির উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে এখন দুনিয়াজোড়া শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে শ্রমিক শ্রেণী ও সকল মেহনতির মৌলিক স্বার্থরক্ষার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য সকল শোষিত স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত শূদ্ধ সক্রিয় সংগ্রামের মাধ্যমেই শোষণমুক্ত, মানুষ কর্তৃক মানুষের নির্যাতনমুক্ত একটি নতুন সমাজ,— যা মানবজাতির ভবিষ্যৎ — গঠনের সম্ভাবনা নিকটতর হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ: অর্থনীতি ও রাজনীতি

একচেটিয়া গোষ্ঠী — শক্তিশালী শিল্প ও ব্যাঙ্কিং পরিমেল গত ও এই শতকের সন্ধিক্ষণে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে উদ্ভূত হয় এবং বর্জ্যোয়া সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রবর্তন করে। অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত পরিবর্তনের সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কুলীন শাসকবর্গের রাজনীতিতেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিতন্ত্র তার বিকাশের এক নতুন পর্যায়ে প্রবিষ্ট হয়, তারই নাম সাম্রাজ্যবাদ। এর রক্তাক্ত পথচিহ্নে আছে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ ও ইঙ্গো-বোয়ার যুদ্ধ — যাতে নগ্ন হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও পাশব হৃৎকার।

১। সাম্রাজ্যবাদ কী?

মার্কস ও এঙ্গেলসের উত্তরসূরী ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) তাঁদের তত্ত্বের

বিকাশ ঘটান এবং এই প্রশ্নটির উত্তর দেন : সাম্রাজ্যবাদ কী?

হরেক রকমের বিপুল পরিমাণ নিভুল তথ্যাদির গভীর বিশ্লেষণ সহ লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন : 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' (১৯১৬)। বইটিতে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর থেকে অর্ধ-শতক ধরে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের যাবতীয় গুণগত পরিবর্তন খোলসা করা হয়েছে। লেনিন এখানে মার্কস ও এঙ্গেলসের আবিষ্কৃত সমাজবিকাশের নিয়মগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্থিতির একটি বিশেষ পর্যায় হিসাবে, তার সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায় হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সারবস্তুর একটি গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে সাম্রাজ্যবাদে পুঁজিতন্ত্রের সবগুলি মৌল বৈশিষ্ট্যই অটুট থাকে : উৎপাদনের উপায়ের উপর পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা, বুদ্ধিজীবী কতৃক মজুরি-শ্রমিকের শোষণের সম্পর্ক এবং বৈষয়িক পণ্যবণ্টনের রূপ, যাতে পুঁজিপতিদের বর্ধমান সম্পদ ও বিলাসের সঙ্গে মেহনতিদের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির কার্যকরতা সাম্রাজ্যবাদের আওতায়ও অব্যাহত থাকে : উৎপাদন-মূল্যের নিয়ম — মূল অর্থনৈতিক নিয়ম; পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম; প্রতিযোগিতা ও উৎপাদনের নৈরাজ্যের নিয়ম, ইত্যাদি। পুঁজিতন্ত্রের

মূল অর্থনৈতিক অসঙ্গতিগুলিও অটুটই থাকে। কিন্তু কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের গোড়ার দিকের পর্যায় থেকে স্পষ্টতই পৃথক।

সাম্রাজ্যবাদের ওই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে প্রকটিত হয়? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদ প্রথমত একচেটিয়া প্রাধান্য দ্বারা ‘অবাধ প্রতিযোগিতাকে’ প্রতিস্থাপিত করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় সমাজ-জীবনের পরিমন্ডলে প্রতিক্রিয়া ও হিংস্রতার দিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মোড়বদল। প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়, এবং এইসঙ্গে তার শেষ পর্যায় তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবেশপথও।

২। উৎপাদন ঘনীভবন ও একচেটিয়া গোষ্ঠী

গত শতকের শেষের দিকে নানা ধরনের শিল্পের দ্রুত বিকাশের ফলে উদ্যোগসমূহের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বড় বড় কলকারখানার দৌলতে সেগুলির মালিকরা অন্যান্য পুঁজিপতিদের তুলনায় অধিকতর সুবিধা লাভ সহ নিজেদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান মজবুত করতে পেরেছিল। কার্যকর পুঁজির আয়তন বৃদ্ধি বড় বড় উদ্যোগ গঠন কিংবা বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছায় অনেকগুলি একক পুঁজির একত্রীকরণের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছিল, যাতে উৎপাদনের উপায়, শ্রমশক্তি ও পণ্যোৎপাদন ক্রমাগত বৃহৎ উদ্যোগে

কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল, অর্থাৎ উৎপাদন ঘনীভবন ঘরিত হচ্ছিল। বৃহৎ উদ্যোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করে এবং অধুনাতম বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত সাফল্যাদি ও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে পুঞ্জিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছিল। একবার উৎপাদনের বড় আকারের অংশভাগ হস্তগত করতে পারলে — যা এক বা একাধিক শাখায় তাদের মূখ্য অবস্থান নিশ্চিত করত — ওইসব উদ্যোগে গড় মাত্রার চেয়ে বেশি মুনামা আসতে থাকত। অসংখ্য একত্রীভবন ও দখল, অর্থাৎ পুঞ্জির দ্রুত ঘনীভবনের ফলেই পুঞ্জিতান্ত্রিক একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল।

একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন ঘনীভবন আপনা থেকেই ক্রমে ক্রমে একচেটিয়া গোষ্ঠী গঠনে পৌঁছায়। এটা এজন্য যে বৃহৎ উদ্যোগগুলির পক্ষে একত্রীভূত হওয়া সহজ ও অধিকতর সুবিধাজনক, কেননা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় তাদের বিরট লোকসান দিতে হয় এবং তাতে প্রতিযোগিতা বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বৃহৎ পুঞ্জিপতিদের জন্য সমঝোতায় পৌঁছন, একটা লাভজনক লেনদেনে শরিক হওয়া খুবই সুবিধাজনক, তাতে পণ্যদর চড়া রাখা যায়, মেলে সর্বোচ্চ মুনামা।

ফলত, উৎপাদন ঘনীভবনের বিপুল বিস্তারই আসলে একচেটিয়া গোষ্ঠী উদ্ভবের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সেজন্যই উৎপাদন ও পুঞ্জির ঘনীভবন এমন উচ্চস্তরে পৌঁছয় যাতে অর্থনৈতিক জীবনে চড়াও ভূমিকাসীন

একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে — এটাই সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মূল অর্থনৈতিক চারিত্র্য।

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে ১০০টি বৃহত্তম মার্কিন কর্পোরেশন মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের বিক্রয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। মার্কিন প্রসেসিং শিল্পের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদের সঙ্গে জড়িত চারটি প্রধান কর্পোরেশন তাদের শাখার ২৫—১০০ শতাংশ উৎপাদের মালিক। জাপানে, শিল্পের ১০০ উপ-শাখায় চারটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের অংশভাগ প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি, এবং প্রায় ৫০ উপ-শাখায় ৮০ শতাংশ। অন্যান্য অনেকগুলি উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশেও চিত্রটি অভিন্ন। ঘনীভবনের এই উচ্চমাত্রাই একচেটিয়ায় উদ্ভব ও অব্যাহত অস্তিত্বের ভিত্তি।

একচেটিয়া কী?

একচেটিয়া হল একটি বড় পুঞ্জিতান্ত্রিক কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহের পরিমেল, যা কোন শিল্পের উৎপাদের বৃহৎ অংশভাগ নিয়ন্ত্রণের দৌলতে বাজারে প্রধান্য বিস্তার ও পণ্যদর ইচ্ছামতো নির্ধারণ করতে পারে এবং এই প্রধান্য উচ্চতর মূল্য, অর্থাৎ একচেটিয়া মূল্যফার বাস্তব রূপ দেয়।

একচেটিয়ারা বহুরূপী। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য — কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট, কনসার্ন ও কনগ্লমারেট। একচেটিয়ার কার্টেল রূপের মূল্য বৈশিষ্ট্য হল দরের স্তর, কোটা, বিক্রয়-শর্ত ও অন্যান্য বাজার-উপাদানের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু কার্টেলভুক্ত কোম্পানিগুলি স্বাধীন উৎপাদক থাকে। ট্রাস্ট-গঠনকারী পুঞ্জিতান্ত্রিক

উদ্যোগগুলিকে কেবল বিপণন নয়, উৎপাদনের স্বাধীনতাও হারাতে হয়। কনসার্ন এক ধরনের একচেটিয়া গোষ্ঠী, যেখানে প্রধান কোম্পানিটি একটি একক সাম্রাজ্য গঠনের জন্য অসংখ্য কোম্পানি ও আপাতদৃষ্টিতে আইনত স্বাধীন কোম্পানিগুলিকে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে আর্থিক কবজা ব্যবহার করে। বর্তমানে কনসার্নগুলি হল একচেটিয়াদের সবচেয়ে পরিব্যাপ্ত রপদ।

একচেটিয়া গোষ্ঠী গঠন ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিযোগিতার অবশেষ বোঝায় না। অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ধৃত একচেটিয়ারা তার লুপ্তি ঘটায় না, তার উপরে ও পাশে টিকিয়ে রাখে এবং এভাবে প্রতিযোগিতাকে সবিশেষে হিংস্র, তীক্ষ্ণ ও ধ্বংসাত্মক করে তোলে। অর্থনৈতিক প্রণালীর পাশাপাশি একচেটিয়ারা প্রায়শই সরাসর হিংস্রতার আশ্রয় নেয়: উদ্যোগে অগ্নিসংযোগ ও বিস্ফোরণ, শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার জন্য ভাড়াটে গদুন্ডা সংগ্রহ, ব্লেকমেইল ও অনুরূপ অন্যান্য কুটকৌশল।

একচেটিয়া মুনীফার জন্যই একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার লড়াই চলে, তাতে থাকে সকল পুঁজিপতির প্রাপ্য গড় মুনীফা, কৃৎকৌশলগত সাফল্যের ফলে প্রাপ্ত বাড়তি মুনীফা ও বিশেষ একচেটিয়া অতি-মুনীফা। এই শেষোক্তটির উৎস — একচেটিয়াদের উৎপন্ন পণ্যের একচেটিয়া চড়া দর এবং একচেটিয়াভুক্ত হয় নি এমনসব উদ্যোগের কাছ থেকে

ক্রীত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য দেওয়া একচেটিয়া নিচু দর। সরবরাহ ও চাহিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়াদের ওস্তাদির দৌলতে তাদের অর্থের অঙ্ক বেড়েই চলে, একচেটিয়া চড়া মদন্যার এতটুকুও খোঁয়া যায় না।

একচেটিয়াদের মদন্যার উৎস হল সর্বপ্রথম একচেটিয়াদের উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং, একচেটিয়া-বহিস্থ পুঞ্জিতান্ত্রিক উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একাংশ, ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদক আর ‘নির্বিচারে জনসাধারণকে’ শোষণ, উন্নয়নশীল দেশগুলির লদুঠন, অর্থাৎ জনগণের সবগুলি স্তরই একচেটিয়া পুঞ্জির শোষণের শিকার ও তাকে করপ্রদানে বাধ্য। লেনিনের ভাষায় ব্যাপক জনসাধারণের উপর একচেটিয়ার শোষণ ‘শতগুণ বেশি গদরদার, অধিকতর দদুর্ভর ও দদুঃসহ’।*

৩। ফিনান্স পুঞ্জি ও ধনকুবেরতন্ত্র

উৎপাদন ঘনীভবন ও শিল্পে একচেটিয়ার উন্মেষ ব্যাঙ্কের কার্যকলাপেও অভিন্ন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। বহুৎ শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও অন্যান্য উদ্যোগ ছোট ছোট ব্যাঙ্কে তাদের দায়মদুত্ত

* V. I. Lenin, ‘Imperialism, the Highest Stage of Capitalism’, *Collected Works*, Vol. 22, 1974, p. 205.

তহবিল জমা রাখতে অস্বীকার করে, কেননা বৃহৎ অঙ্কের জমার নিরাপত্তা দেয়ার মতো আয়তন ওগুদিলি ছিল না। বৃহৎ উদ্যোগগুলিকে ঋণ দেয়ার মতো তহবিল ছোট ছোট ব্যাঙ্কের থাকত না এবং বৃহৎ অঙ্কের ঋণের জন্য প্রথমোক্তের চাহিদার দরুনই মূলত বড় বড় ব্যাঙ্কের উদ্ভব ও ব্যাঙ্কিং একচেটিয়াদের উন্মেষ ঘটেছিল।

তিনটি দৈত্যাকার ব্যাঙ্ক এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাঙ্ক-সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। অনুরূপ তিনটি ব্যাঙ্কের হাতে আছে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ও ইতালির ব্যাঙ্ক-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এবং গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডার ব্যাঙ্ক-সম্পদের ৫০-৬০ শতাংশ।

বিপুল তহবিল সঞ্চয়ের কল্যাণে ব্যাঙ্কিং একচেটিয়ারা বিশুদ্ধ ক্রেডিট ক্রিয়াকর্ম থেকে শিল্পের স্টক ক্রয় ও নতুন সমিতিগত উদ্যোগ সৃষ্টিতে হাত দেয়, তাতে শিল্পোৎপাদনে তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে এবং তারা ক্রেডিট ও পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যকলাপের সাধারণ মধ্যগ থেকে সর্বশক্তিমান একচেটিয়া হয়ে ওঠে।

বৃহৎ শিল্প-পুঁজিপতিরা তাদের দিক থেকে ব্যাঙ্কিং একচেটিয়াদের স্টক কিনতে থাকে, নিজেদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে, ফলত তাদের সম্পত্তি ও প্রতিষেধী মালিকানার অধিকার একচেটিয়া ব্যাঙ্কিং ও শিল্প পুঁজির আন্তঃপ্রবেশনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

এভাবেই গড়ে উঠেছিল ফিনান্স পুঁজি এবং এখন তা পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের সর্বক্ষেত্রে প্রবিষ্ট ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশের গোটা অর্থনৈতিক জীবন তার অধীনস্থ।

ফিনান্স পুঁজি ধনকুবেরতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। বর্জ্যোয়াদের উপরতলার এই ক্ষুদ্রে স্তরটি অর্থনীতির সবগুণি শাখাকেই কন্জা করেছে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অধিকার পেয়েছে। ধনকুবেররা ‘ব্যক্তিগত সংঘ’ ও ‘হোল্ডিং’ প্রণালীর মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে, তাতে তারা বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে পারে। ‘হোল্ডিং’ প্রণালীটি পিরামিডের সঙ্গে তুলনীয়, যার চুড়ায় থাকে বৃহত্তম ব্যবসায়ীরা, তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতা বর্তায় শৃঙ্খল ‘জনক’ জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতেই নয়, এটির উপর নির্ভরশীল তার অনুমোদিত সংস্থাগুলির উপরও। ‘ব্যক্তিগত সংঘ’-এর সারবস্তু হল অভিন্ন একদল লোক ও বস্তুত পুরো পরিবার শিল্প, ব্যাংক, বাণিজ্য ও অন্যান্য একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে থাকে। বড় বড় ব্যাংকমালিক হয় শিল্পোদ্যোগসমূহের পরিচালনা বোর্ডের ডিরেক্টর বা সদস্য, আর শিল্প-কোম্পানিগুলির প্রধানরা থাকে ব্যাংকের কাউন্সিলগুলির সদস্য বা বোর্ডের চেয়ারম্যান। একইসঙ্গে তারা ব্যবসা চালায় তাদের সকলের লাভ ও সম্পদবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

৪। পুঁজি রপ্তানি

একচেটিয়া গোষ্ঠী ও ফিনান্স পুঁজি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি চারিত্র্যও দেখা দিয়েছিল : দ্রুত পুঁজি রপ্তানি। পুঁজি রপ্তানি হল একটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশ থেকে অন্যান্য দেশে পুঁজির স্থানান্তরণ এবং সেইসব দেশে একচেটিয়াদের জন্য অতি-মুনাফা আহরণ, বাইরের বাজারে একচেটিয়াদের অবস্থান মজবুত, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের পরিসর বৃদ্ধি ও অন্যান্য অন্যায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি। পুঁজি রপ্তানির দৌলতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়ারা অন্যান্য দেশের শ্রমশক্তি শোষণ করে অটেল অতি-মুনাফা আদায় করতে এবং বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল নিজেদের আওতায় রাখতে পারে।

পুঁজি রপ্তানি হল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রণালীর অন্তর্গত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কেননা তা সারা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিস্তার স্বরূপে বড় বড় একচেটিয়াদের সহায়তা যোগায়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূখ্য পুঁজি রপ্তানিকারী ও পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রধান অর্থশোষক হয়ে ওঠে। জার্মানি, ইতালি ও জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন তাদের বৈদেশিক বিনিয়োগের মোটা অংশই হারায় এবং

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবস্থানও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটেন তার যুদ্ধপূর্ব বৈদেশিক লগ্নির ২৫ শতাংশ বিক্রি করে দেয় এবং ফ্রান্স ও হল্যান্ডের বিনিয়োগ ৫০ শতাংশ সংকুচিত হয়। যুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্ষিক পুঁজি রপ্তানি ও মোট বৈদেশিক লগ্নিতে সুদৃঢ় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু ১৯৭০-র দশকে ও ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় জাপান, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশ পুঁজি রপ্তানির হারে মার্কিন পুঁজি রপ্তানিকে অতিক্রম করে যায় এবং মোট বৈদেশিক বিনিয়োগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশভাগ কিছুটা হ্রাস পায়।

পুঁজি রপ্তানির মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও প্রক্রিয়াটি ছিল অসম ও তা গতিপথ বদলায়: বিশ শতকের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে রপ্তানিকৃত পুঁজির মোটা অংশ গেছে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলিতে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের বেশির ভাগ যাচ্ছে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন এবং সত্যিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সদ্যস্বাধীন দেশগুলির প্রবল সংগ্রামের ফলে পুঁজিতন্ত্রের 'দখলী স্বত্বের' এলাকাটি সংকুচিত হওয়ার দরুন বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেজন্যই বৈদেশিক বেসরকারী পুঁজির মূল ধারাটি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির দিকেই বইছে। তবে লক্ষণীয় যে, ১৯৭০-র দশকে বেসরকারী পুঁজিলগ্নির

ক্ষেত্র হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশভাগের আপেক্ষিক হ্রাস থেমে গেছে ও ক্রমাগত বাড়তে শুরুর করেছে এবং তার কারণ: কাঁচামাল ও শক্তি-উৎপাদক সামগ্রীর নিদারুণ সংকট, উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন কোন শিল্পের 'অতিপুঁজি', ইত্যাদি।

৫। বিশ্বের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজন

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া গোষ্ঠী কর্তৃক বিশ্বের অর্থনৈতিক বিভাজন ও প্রধান পুঁজিবাদী শক্তি কর্তৃক বিশ্বের চূড়ান্ত আঞ্চলিক বিভাজন — সাম্রাজ্যবাদের আরও দুইটি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, যেগুলি পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কী? এরা বড় বড় একচেটিয়া, যারা গোটা অঞ্চলগুলির বা গোটা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিসরে সক্রিয়। প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের বিভাজন ও পুনর্বিভাজনে শরিকানা, পুঁজি রপ্তানি, আন্তর্জাতিক কার্টেল চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ও বৈদেশিক সম্প্রসারণের অন্যান্য ধরনের আশ্রয়ে কোন জাতীয় একচেটিয়া আন্তর্জাতিক একচেটিয়া হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক জাতীয় একচেটিয়াই এক সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক একচেটিয়া, কেননা যেকোন জাতীয় একচেটিয়াই দেশের বাজারের আওতায় নিজ সম্প্রসারণবাদী অভিলাষ সীমিত রাখে না। বিকাশের

একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সে দেশের সীমানা অতিক্রম করে ও নির্ভেজাল জাতীয় একচেটিয়া থাকে না।

একচেটিয়া প্রথমে জাতীয় বোর্ডগুলির উপর প্রাধান্য অর্জন করে এবং অতঃপর অন্যান্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। উৎপাদন ও পুঁজির ঘনীভবন এতটা উঁচুতে পৌঁছয় যে গোটা বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিই বৃহৎ সংখ্যক একচেটিয়ার কার্যকলাপের ক্ষেত্র হয়ে যায় এবং তাতে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয় বিশ্বের অর্থনৈতিক বিভাজনের লড়াই। লেনিন বলেছিলেন যে পুঁজিপতিরা বিশ্বকে বিভক্ত করে... কেননা 'ঘনীভবনের যে-মাত্রা অর্জিত হয় তাই মুনাসা সংগ্রহের জন্য তাদের এই পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করে। এবং একে ভাগ করে 'পুঁজির অনুপাতে', 'শক্তির অনুপাতে', কেননা পণ্যোৎপাদন ও পুঁজিতন্ত্রের অধীনে বিভাজনের অন্যতর কোন পদ্ধতি সম্ভবপর নয়।'*

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া বিশ্বের পুঁজিতান্ত্রিক এলাকার অর্থনৈতিক বিভাজন নানাভাবে নিষ্পন্ন করে এবং এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য — প্রভাবের বলয়গুলি বিভাগ ও পুঁজি রপ্তানি সম্পর্কে সমঝোতা। সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি পদ্ধতির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু বিপণনের পথসন্ধান, কাঁচামালের উৎস ও পুঁজি বিনিয়োগের সর্বাধিক লাভজনক ক্ষেত্রগুলি

* ভ. ই. লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৩।

নিয়ে আস্তঃএকচেটিয়াদের লড়াইয়ে এমনকি আজও এই দুটিই তাদের হাতিয়ারের ভাণ্ডারে মজদুত রয়েছে।

এই শতকের প্রথমার্ধে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ববিভাজনের চুক্তিগদুলি সাধারণত আন্তর্জাতিক কার্টেলের রূপলাভ করত এবং ইতিহাসের ধারায় এগুলির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৈল, রাসায়নিক, তড়িৎ-কৃৎকৌশল ও অন্যান্য বহু শিল্পে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক কার্টেল গড়ে উঠেছিল এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের সদস্যদের তৈরি উৎপাদের দর উচ্চস্তরে রাখা, যাতে একচেটিয়া মুনায়ফা নিশ্চিত থাকে। দুনিয়াজোড়া খন্দেরদের আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলির উৎপাদনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

সাবেকী ধরনের আন্তর্জাতিক কার্টেলের সংখ্যা এখন আর খুব বেশি নেই। এগুলিরই একটি ‘আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিক পরিমেল’ তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে আজও অনেকটা তেমনই রয়ে গেছে। বস্তুত, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সবগুলি অগ্রণী একচেটিয়াই এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরিমেলটি বহুদুর্পী গিরগিটির মতো তার রঙ পালটানোর চেষ্টা করলেও খন্দেরদের শোষণ ও তাদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায়ের জন্য নিজ সদস্যদের হাতে গোটা পুঁজিতান্ত্রিক বাজারের ‘নিয়ন্ত্রণ’ অটুট রাখার ব্যাপারটি প্রায়ই খোলসা হয়ে পড়ে।

সাবেকী আন্তর্জাতিক কার্টেলের অনেকগুলি বিভক্ত হয়ে গেলেও তাতে এটা বোঝায় না যে বিভিন্ন দেশের

একচেটিয়ারা পরস্পরের সঙ্গে এখন আর কার্টেল চুক্তি সম্পাদন করে না। এই ধরনের চুক্তিগদূলি ইদানীং নিপদুগভাবে ছন্দরদুপ নেয়, তাতে থাকে সীমিত সংখ্যক সদস্য এবং প্রভাব-বলয় পদুনব'টনের জন্য লড়াইয়ের একটি ধরন হিসাবে পদুজি রপ্তানির সঙ্গে এগদূলি আরও বেশি বিজড়িত। আজকালও একচেটিয়ারা বাজার দখলের লড়াইয়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে আন্তর্জাতিক কার্টেল চুক্তি ব্যবহার করে।

উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিভাজন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগদূলির মধ্যে বিশ্বের আঞ্চলিক সক্রিয় বিভাজন ছিল সমান্তরাল ঘটনা, যাতে লভ্য উপনিবেশ দখল ঘরিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের বার্তাবহরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী লদু'ঠনের জয়গানে মদুখরিত। এদেরই অন্যতম ব্রিটিশ লেখক রদুডিয়ার্ড কিপলিং বলতেন ব্রিটিশ বন্দরের বাতিঘরগদূলি সারা দুনিয়ায় অভিযাত্রীদের পাঠাচ্ছে ও যদুদ্ধভেট নিয়ে তাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছে। তিনি অন্যান্য জাতির শাসক, সামরিক শক্তিতে বলবান ব্রিটেনের প্রশংসামদুখর ছিলেন, কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উপনিবেশের বাসিন্দারা ব্রিটিশ সৈনিকদের ভালবাসে, তাদের ফিরে আসার সময় মন কেমন করে। ব্রিটিশ সৈন্যদের হিংস্রতা ও লদু'ঠন গোপন করার কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। 'পে'চ-কাটা বন্দুক' নামের একটি কবিতায় ব্রিটিশ সৈন্যদের

বাধা না দেয়ার জন্য এই কবি ‘একগুয়ে বব’রদের’
হুঁশিয়ার করেছেন:

‘তোমাদের সদাঁরকে পাঠাও, আত্মসমর্পণ করো,
লড়াই বা পালানো দুটোই নিরর্থক:
লুকতে পারো গুহায়, ওগুদিল হবে তোমাদের কবর,
কিন্তু পালাতে পারবে না, পেভনে উদ্যত বন্দুক!’

১৮৭৬ — ১৯১৪ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী
শক্তিগুলি পরদেশের প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ
কিলোমিটার এলাকা দখল করে। ১৮৮১ সালে ফ্রান্স
টিউনিসিয়া, ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিশর ও ১৮৮৪
সালে জার্মানি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দখল করে
নেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে
তখনো যেসব জাতি স্বাধীন ছিল তাদের অধীনস্থ
করার জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে
প্রতিযোগিতা চলছিল। অধিকাংশ দেশ দখল করে
ব্রিটেন ও ফ্রান্স। বিশ শতকের গোড়ার দিকে
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের মধ্যে বিশ্ববিভাজন
সম্পূর্ণ করে এবং ভাগবাটোয়ারার মতো ‘দখলহীন’
আর কোন ভূমি অবশিষ্ট ছিল না, তাই প্রাক্তন
মালিকের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে হটানোই ছিল
দেশদখলের একমাত্র পন্থা। ‘নবীন পুঁজিতন্ত্রের’ (১৯
শতকের শেষ নাগাদ যেগুলি দ্রুত শক্তিশালী হয়ে
উঠছিল) দেশগুলি — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি
ও জাপান — পেয়েছিল সীমিত সংখ্যক উপনিবেশ।

এই দেশগুলি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল এবং পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতিতে তাদের অংশভাগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। শক্তিস্থিতির পরিবর্তিত অননুপাত ওইসব দেশের পুঁজিপতিদের সবলে ঔপনিবেশিক দখল পুনর্ব্যবস্থাপন প্ররোচিত করেছিল।

৬। অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ

সাম্রাজ্যবাদের অধীনেই বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব। এটা হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক একটি প্রণালীর (বৈদেশিক বাণিজ্য, পুঁজি রপ্তানি, ক্রেডিট ও আর্থিক সম্পর্ক, ইত্যাদি) মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতির যোগফল এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজন। বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বস্তুত নৈরাজ্য, অসামঞ্জস্য, তীব্র অর্থনৈতিক অসঙ্গতি ও পর্যায়িক উৎক্ষেপে সূচিচিত। ভাষান্তরে, একক পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতির মতো এটিও অভিন্ন চারিত্রিক বস্তুদৃষ্ট।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের যুগে আত্যন্তিক তীব্রতা লাভ করেছে, কেননা অসম বিকাশ খেদ পুঁজিতন্ত্রের এক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। এটি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রতিযোগিতার নিয়ম ও নৈরাজ্য দ্বারা শাসিত, যে-উৎপাদন উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক। কিন্তু, প্রাক-একচেটিয়া যুগে পুঁজিতন্ত্র অল্পবিস্তর নির্বিকশিত হলেও

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরিস্থিতির প্রবল পরিবর্তন ঘটেছিল।

বিকাশ ঘটিছিল অতি দ্রুত: কয়েকটি দেশ দ্রুত এগাচ্ছিল, অন্যরা পড়েছিল অনেকটা পিছিয়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৮৭০-র দশকের আগ অবধি ব্রিটেন ছিল শিল্পোৎপাদনে বিশ্বে সর্বাগ্রগণ্য, তারপরই ফ্রান্স। প্রায় এক দশকের মধ্যে, ১৮৮০-র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে অতিক্রম করে এবং আরও এক দশকের মধ্যে, ১৮৯০-র দশক নাগাদ ব্রিটেনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে প্রথম স্থান দখল করে নেয়। একই মেয়াদের মধ্যে জার্মানি ফ্রান্সকে ছাড়িয়ে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পর তৃতীয় স্থানে পৌঁছয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানি ব্রিটেনকে হটিয়ে দেয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় স্থান দখল করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই ধরনের বিকাশের দরুন ইতিমধ্যে বিভক্ত বিশ্বের পুনর্নির্ভাজনের জন্য সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। শক্তিস্থিতির অনুপাত পরিবর্তনের জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া শত্রুভাবাপন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ফলত অনিবার্য হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে বৃহৎ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুটিই শুরু করেছিল একচেটিয়া পুঁজি মূলত সামরিক উপায়ে শক্তিস্থিতির পরিবর্তনকে নিজ অনুকূলে আনার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অসম অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন প্রভাববলয়, বিপণন বাজার ও

কাঁচামালের উৎস পুনর্ব্যবস্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র অসঙ্গতির উদ্ভব ঘটেছে ও প্রচণ্ড সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে, ফলত কোন কোন দেশ হেরে গিয়ে পিছদ হটছে এবং অন্যরা জয়ী হচ্ছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যুদ্ধোত্তরকালে জাপান, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বিকশিত হয়েছে, তাতে বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন, রপ্তানি ও স্বর্ণমজুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশভাগ কমে গেছে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে তীব্রতর অসঙ্গতির ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির বর্ধমান অসম অর্থনৈতিক বিকাশের সমান্তরালে ঘটেছে তাদের অধিকতর অসম রাজনৈতিক বিকাশ, যার একটি বিশেষ ফলশ্রুতি হল তীব্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট, যাতে বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন কালপর্বে সমাজবিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিয়মের আবিষ্কারক লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এক ও অভিন্ন সময়ে, অধিকাংশ বা সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (যা মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করতেন) ঘটান অসম্ভব, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলটিকে তার একটি দুর্বল গ্রন্থিতে ভেঙ্গে ফেলা অবশ্যই সম্ভব, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি একটি দেশেও জয়যুক্ত হতে পারে। ১৯১৭ সালে

রাশিয়ায়, একটি তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, যা লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণী অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, পৃথিবীর প্রথম বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লব সংঘটনে ব্যবহার করেছিল।

৭। সাম্রাজ্যবাদ: পরজীবী, ক্ষীয়মাণ পুঞ্জিতন্ত্র

সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে এটি এক পরজীবী ও ক্ষীয়মাণ পুঞ্জিতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে মর্দুটিমের একচেটিয়া ও ধনকুবের গোষ্ঠীর আধিপত্যের ফল হিসাবেই এই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। লেনিন বলেছিলেন: ‘একচেটিয়া, ধনকুবেরতন্ত্র, স্বাধীনতার বদলে আধিপত্যের প্রচেষ্টা, মর্দুটিমের সমৃদ্ধতম বা সর্বশক্তিমান জাতি কর্তৃক ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ক্ষুদ্র বা দুর্বল জাতিগণের শোষণ — এইসবই সাম্রাজ্যবাদের সেইসব প্রকট বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয় যাতে তাকে পরজীবী ও ক্ষীয়মাণ পুঞ্জিতন্ত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।’*

একচেটিয়ারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের পথে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধ। তারা ভালই জানে যে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি এবং সেজন্যই এগুনিকে তারা তাদের যথার্থ ও সম্ভাব্য

* ভ. ই. লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০০।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের হস্তগত হতে দিতে চায় না। তা ছাড়া তারা কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবনের পথ সীমিতকরণের জন্যও কঠোর প্রয়াস পায়। অধিকন্তু, কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে সত্যিকার আশংকা না থাকলেও একচেটিয়ারা প্রায়শই স্বেচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদনে শম্বুকগতিতে নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রয়োগ করে, আর এইসবগুলিই বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমাজে বিজ্ঞানের বাস্তব অগ্রগতিতে মারাত্মক প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। একচেটিয়াদের সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির মন্থরতা আমাদের কালে সবিশেষ সহজলব্ধ, যখন মধ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে সৃজনশীল উদ্দেশ্যের বদলে অন্যতর অভিমুখে, অর্থাৎ অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও ব্যাপক নরমেধের জন্য অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে চালিত করছে, যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে একটি কুশ্রী ও সমরবাদী মোচড় দেওয়া যায়। একচেটিয়ারা মানুষের বুদ্ধির সাফল্যগুলিকে খোদ মানবজাতির বিরুদ্ধেই কাজে লাগায়।

ফিনান্স পুঁজি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্যকে মুনাকা বৃদ্ধি ও মেহনতিদের অধিকতর শোষণের জন্য ব্যবহার করে। লেনিনের ভাষায়: ‘সব দিকে, প্রতি পদক্ষেপে আমরা এমনসব সমস্যার মুখোমুখি হই যোগগুলির আশ্রয় সমাধানে মানুষ যথেষ্টই সক্ষম, কিন্তু পুঁজিতন্ত্র তাতে বাধা দেয়। সে অটল বিত্ত সঞ্চয় করেছে এবং মানুষকে বিত্তের দাস বানিয়েছে। সে জটিলতম সব কৃৎকৌশল সমস্যার সমাধান করেছে ও

কৃৎকৌশলগত সাফল্যের প্রয়োগ অবরুদ্ধ করেছে, এবং তা কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার দরুন, মর্দুষ্টিমেয় কোটিপতির নির্বোধ ধনালিপ্সার দরুন।*

‘কুপন-কাটা’ পুঁজিপতি (রপ্তানিতে) — লগ্নি-আয়সর্বস্ব, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী পুঁজিপতিদের বর্ধমান স্তর হল পুঁজিতন্ত্রের অবক্ষয়ের প্রমাণ। এইসব পুঁজিপতি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, কেননা তাদের উদ্যোগগুলি চালায় বেতনভোগী ম্যানেজাররা। শটক, বন্ড ও বড় ব্যাঙ্ক-আমানতের মালিক পুঁজিপতিরা সুদধারী কুপনের উপরই বেঁচে থাকে, যেগুলি তারা তাদের আমানত থেকে কেটে কেটে জমা করে। বস্তুত, সবগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই এখন পরশ্রমজীবী রাষ্ট্রে পরিণত: ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেকগুলি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আয়ের বড় একটা অংশই পুঁজি রপ্তানি থেকে অর্জিত।

লেনিন বলেছিলেন যে পুঁজি রপ্তানি হল নিরন্তর পরজীবিতা, কেননা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পুঁজি নিজেই আত্মসাৎকৃত উদ্ভূত-মূল্য, মজুরি-শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ফল হয়ে ওঠে। বিদেশে রপ্তানিকৃত পুঁজি তার মালিকদের জন্য অধিকতর পরিমাণ মুনাবা অর্জন করে এবং তা পরদেশ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসাবে কেবল কাজ করার জন্যই নয়, কিছু

* V. I. Lenin, ‘Civilised Barbarism’, *Collected Works*, Vol. 19, 1973, p. 389.

পরিমাণে (প্রায়শ খুবই যথেষ্ট) পুঞ্জি রপ্তানি-কারী দেশের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ প্রহত করেও।

সাম্রাজ্যবাদের পরজীবিতা সর্বাধিক প্রকটিত অর্থনীতির সামরিকীকরণে এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে জাতীয় আয়ের হ্রস্ববর্ধমান সুবৃহৎ একটা অংশ বরাদ্দকরণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত অন্যান্য দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণের দরুন বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনশীল পরিভোগ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে বিপুল বৈষয়িক মূল্য ধ্বংস হয়, ব্যাপক জনক্ষয় ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট জাতীয় সম্পদের তিনগুণ মূল্যের বেশি।

পুঞ্জিতন্ত্রের অবক্ষয় লভ্য উৎপাদনী শক্তি ব্যবহারে একচেটিয়া পুঞ্জির অক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকুরি সংস্থান, উৎপাদনী উদ্যোগগুলিতে পূর্ণসামর্থ্য ব্যবহারের ব্যর্থতার মধ্যেও প্রকটিত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যুদ্ধোত্তরকালে উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদনী সামর্থ্য ব্যবহার সরকারীভাবে কথিত 'উপযুক্ত' পর্যায়ে কখনই পৌঁছয় নি, প্রায়শই নেমে গেছে মোট সামর্থ্যের ৭০-৮০ শতাংশে। দীর্ঘস্থায়ী বেকারির অর্থ পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশে সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি, মেহনতিদের অবিরাম অবব্যবহার।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে সর্বাধিকার প্রবণতার উদ্ভব সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ও পরজীবিতার এক বিশেষ অভিব্যক্তি। একচেটিয়া অতি-মুনাফা থেকে পাওয়া উৎসের দৌলতে শ্রমিক শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র স্তর, যাকে বলা যায় 'শ্রমিক অভিজাতবর্গ', সেটা সৃষ্টির জন্য ঘৃস দেওয়া সম্ভব হয়, যারা প্রায়ই বুরজোয়ার সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনে নেতৃপদ দখল করে নেয়। পেটি-বুরজোয়া লোকদের সঙ্গে একযোগে তা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে বড় ধরনের বিপদ সৃষ্টি করে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সামাজিক ভিত্তি হয়ে ওঠে। শ্রমিক অভিজাতবর্গ শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ স্তরকে বিভক্ত করে এবং এভাবে একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামে শক্তিগুলির মেলবন্ধনে বাধা দেয়।

সাম্রাজ্যবাদ উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতিতেই শূন্য পরজীবিতা বৃদ্ধি করে না, তাদের রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিক্রিয়ার বিস্তার ঘটায়।

৮। সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি

রাজনীতি হল শ্রেণীসমূহ ও বিবিধ সামাজিক বর্গের মধ্যকার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের একটি বলয়, যার মূল উদ্দেশ্য — রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, টিকিয়ে রাখা ও ব্যবহার। লেনিনের ভাষায় 'রাজনীতির

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাষ্ট্রক্ষমতা সংগঠন'।* সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আসলে রাজনীতির চূড়ান্ত নির্ধারক। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি সর্বোপরি প্রকটিত করে বুদ্ধিজীবীর, শাসকশ্রেণীর স্বার্থ, এবং বুদ্ধিজীবীর অধিকার ও সুবিধা রক্ষার লক্ষেই তা পরিকল্পিত। বুদ্ধিজীবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন দমন, ব্যক্তিগত মালিকানার নিরাপত্তা বিধান ও পুঁজিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এক বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে।

পুঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের পর্বায়ে পৌঁছলে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকচক্রের অনুসৃত কর্মনীতিতেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ওইসব দেশে অর্থনৈতিক জীবনে একচেটিয়া প্রাধান্য 'সর্বত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া' অভিমুখী প্রবণতা তীব্রতর করে তুলেছিল এবং তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দমনমূলক সংস্থাগুলির (পুলিশ, 'আইন ও শৃঙ্খলা' বাহিনী, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা, ইত্যাদি) ব্যাপক বৃদ্ধিতে, বুদ্ধিজীবী বৈধতা ভঙ্গে ও বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য বর্বর ব্যবস্থার আগ্রয় গ্রহণে। সেজন্য তা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে সাম্রাজ্যবাদের যুগেই কয়েকটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বর্বরতম

* V. I. Lenin, 'Liberal and Marxist Conceptions of the Class Struggle', *Collected Works*, Vol. 19, p. 122.

প্রকাশ্য ধরনের একনায়কত্ব ফ্যাসিজম দেখা যায়।

রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়ার দিকে মোড় অবশ্য আগেই তাঁর বুদ্ধিজীবী শাসনের পদ্ধতি ও ধরনগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়া বোঝায় না, কেননা তারা মোটামুটি দেশকে, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের পর্বায়েও, সংসদ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (যাতে একনায়কত্ব ঢাকা পড়ে) পরিচালনার পক্ষপাতী।

লেনিন বলেছিলেন: 'একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আসলে পুঁজিতন্ত্রের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম রাজনৈতিক খোলস, এবং সেজন্য একবার পুঁজি সেই সেরা খোলসটি দখল করলে... সে নিজ ক্ষমতা এতটা নিশ্চিতভাবে, এতটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে বুদ্ধিজীবী-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা পার্টির কোন বদলই তাকে এতটুকু টলাতে পারে না।'*

যেকোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে শাসনের রূপ নির্বিশেষে (দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও সুইডেনে — সাংবিধানিক রাজতন্ত্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র — বুদ্ধিজীবী-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) বড় বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদের বশব্দরাই রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি করে। সেই ১৯১৪ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম উইলসন বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসক আসলে সেদেশের শিল্পপতি ও পুঁজিপতির জোট, এবং

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, 1977, p. 398.

কংগ্রেসের দলিলপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা ও শ্বেত প্রাসাদের সম্মেলনের ইতিহাস থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই দেশের অর্থনৈতিক কর্মনীতির পরিকল্পনার একটিই উৎস, একাধিক নয়। শ্বেত প্রাসাদের ঘনিষ্ঠ অন্যতম মার্কিন কোটিপতি আলফ্রেড ব্লুমিংডেইল মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা আসলে 'জেনারেল মোটরস' কোম্পানি চালানোর মতোই, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকারে ২-৩ গুণ বড় হলেও শেষাবধি তা 'জেনারেল মোটরসের' মতোই, আর ওখানেই আমাদের শিকড় গাঁথা রয়েছে। রনাল্ড রেগনকে তিনি অভিন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ঘিরে রাখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এরা হল সেইসব লোক যাদের পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসার জন্য ভাড়া খাটায়। এইসব লোকেরা কাদের স্বার্থবাহক তা খুবই স্বচ্ছ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সহ একটি দেশকে কীভাবে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা পরিচালনা করে? প্রক্রিয়াটি নির্বাচনী প্রচারাভিযান সংগঠন লক্ষ্য করলেই সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশে নির্বাচনী ফাঁদ পাতার লক্ষ্য হল 'অবাধ বাছাইয়ের' একটি মোহ নির্মাণ: বক্তৃতাবার্জি ও মিথ্যার ব্যাপক ও দক্ষ প্রয়োগে একচেটিয়া মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে জনমত গঠন এবং নির্বাচনী প্রচারের গোটা পর্বে সার্কাসের আবহ সৃষ্টি। এইসঙ্গে নির্বাচনে শরিকানায় ইচ্ছুক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনগুলির পথে বিবিধ বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের ঢল নামে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটারদের 'অবাধ বাছাই' আসলে কী, যাকে পশ্চিমের দেশগুলি গণতন্ত্রের 'আদর্শ' ও 'নমুনা' হিসাবে দেখে? প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী অভিযানে 'বাছাইয়ের স্বাধীনতা' দুটি প্রধান বুর্জোয়া পার্টির (রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক) মনোনীত দুই প্রতিনিধির একজনকে নির্বাচনের মধ্যেই মূলত সীমিত থাকে। এই মনোনীতদের মধ্যে পার্থক্য থাকে সামান্যই, কেননা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূল বিষয়গুলিতে তাঁরা অভিন্ন স্বার্থ ব্যক্ত করেন: একচেটিয়া পুঁজি ও ধনকুবেরতন্ত্রের স্বার্থ। নির্বাচকমণ্ডলী কাকে ভোট দেয়? তারা নিজেরা যাকে মনোনীত করেছে তাকে? না, তা নয়। সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী মর্নিংস্টেমের লোক পর্দার আড়ালে যাদের বাছাই করে, তাদেরই একজনকে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক অধিকার ভোটাররা পায়। কার্যত ব্যাপারটি এভাবে গৃহস্থান হয়: সাধারণত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ৩-৪ মাস আগে ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বাদ্যোদ্যম, ঐকতান সঙ্গীত, রঙিন বেলুন উড়য়ন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সহ বিনোদন ও জাঁকজমক সহকারে। প্রতিনিধিরা যখন এই আনন্দভোগে বিভোর তখন পার্টি-নেতাদের একটি ক্ষুদ্রে দল ধনকুবের গোষ্ঠীর হুকুম মোতাবেক প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য 'ধোঁয়াচ্ছন্ন পেছনের ঘরে' বৈঠক বসায়। তারপর তা অনুমোদনের জন্য কনভেনশনের প্রতিনিধিদের সামনে ও শেষে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আনা হয়।

ডেমোক্র্যাটিক বা রিপাবলিকান পার্টির মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নির্বাচিত হতে পারে না কেন? কেননা একটি সফল নির্বাচনে প্রচারাভিযান চালনার জন্য প্রয়োজন কোটি কোটি ডলার এবং বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় আর্থিক সমর্থনপুষ্ট এই দুটি পার্টির পক্ষেই কেবল এমন বিপুল অঙ্কের অর্থসংগ্রহ সম্ভব। বর্তমান নির্বাচন খরচাটি এরূপ: শ্বেত প্রাসাদের প্রভু — ৩০ কোটি ডলার, সিনেটর — ৫০ লক্ষ ডলার, কংগ্রেসম্যান — ৫ লক্ষ ডলার। সেজন্য মার্কিন সিনেটে একটিও শ্রমিক নেই: সকল সিনেটরই একচেটিয়াদের লোক — সরাসরি কিংবা নির্বাচন খরচা যোগানোর সূত্রে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা মোটেই পরার্থবাদী হওয়ার পাত্র নয়। তারা কখনই অযথা ডলার খরচা করে না। রাজনীতিতে নিজেদের প্রিয়পাত্রের উপর অর্থপণ রাখলে তারা ওদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত সেবার প্রতিদান প্রত্যাশা করে।

প্রসঙ্গত বার্নার্ড শ'র নাটকের একটি সংলাপ উল্লেখ্য। কোটিপতি আন্ডারশাফ্ট ছেলেকে বলছে: 'আমিই তোমার দেশের সরকার, আমি আর লাজারাস। তুমি কি ভাবো যে তুমি আর তোমার মতো একগুঁড়া লোক ওই হাস্যকর আড্ডাঘরে একসারিতে বসে শাসন করতে পারো?... না, বন্ধু না: আমাদের যাতে লাভ হয় তোমরা তাই করবে।' এ মোটেই কোন সাহিত্যিক অতিশয়োক্তি নয়, এ হল সাম্রাজ্যবাদী দেশের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সত্য।

কোটিপতি হাওয়ার্ড হিউজেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের

সময় তাঁর 'বন্ধুদের' একই বিষয়ে লিখেছিলেন যে তিনি এমন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চান যিনি তাঁর পছন্দসই, যিনি তাঁর গোষ্ঠীর কাছে ঋণী ও তা অবহিত। এটা অর্জনের জন্য অর্থব্যয়ে তিনি কোন কাপণ্য করবেন না।

তাহলে কীভাবে বলা যায় যে মার্কিন নির্বাচন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক, যখন একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘুর — দেশের জনসংখ্যার অতিনগণ্য একটা অংশের — স্বার্থানুকূল্যে জাতীয় বিধান সভা ও কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলি পরিচালনা করে? অধিকাংশ উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নির্বাচন আসলে একচেটিয়াদের একটি আড়াল, যার পেছনে তারা তাদের নোংরা রাজনৈতিক লেনদেন চালায়। এইসব নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নকলবাজি, তাতে ঢাকা থাকে বহু পুঁজির সর্বশক্তিমান ক্ষমতা। বহু বৎসর পূর্বে লেনিন যা বলেছিলেন আজও তা সত্য বৈকি: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আর কোথাও... গোটা সমাজের উপর পুঁজির ক্ষমতা, মূর্খিমের কোটিপতির ক্ষমতা এতটা স্ফুল, খোলাখুলিভাবে এতটা দৃষ্টাতিগ্রস্ত নয়।'*

একচেটিয়া বুর্জোয়া মেহনতিদের প্রতারণা করার এবং তাদের অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার

* V. I. Lenin, 'The State', *Collected Works*, Vol. 29, 1977, p. 486.

সংগ্রামকে বিপথে চালনার জন্য জনগণের অতিপ্রিয় গণতন্ত্রের স্লেগানাটি ব্যবহার করে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের মেহনতিরা বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত, যোগদানি ছাড়া সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক সমাজ কল্পনীয় নয়। এই অধিকারগর্হিত কী? প্রথমেই, কাজের, সামাজিক নিরাপত্তার, অবকাশ ও বিশ্রামের, শিক্ষার ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের অবাধ ব্যবহারের অধিকার, ইত্যাদি। পুঁজিতন্ত্রে ব্যাপক বেকারি, মদুদ্রাস্থিতি, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, সামাজিক ব্যয়ের অপচয়ের দরদুন কোটি কোটি নরনারী এইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে মেহনতিদের রাজনৈতিক অধিকারও অনুরূপ সীমিত ও খণ্ডিত বৈকি।

বিস্ফোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতার দাবি জানালে পুঁজিশের কর্তা বলবে: 'যাও, যেমন খুঁশি বিস্ফোভ প্রদর্শন কর। তোমাদের আছে বিস্ফোভ প্রদর্শন করার স্বাধীনতা, আর আমাদের আছে সেগুনি ভাঙ্গার স্বাধীনতা।' পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ প্রতি বছর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাঠিধারী পুঁজিশের হামলায় আহত ও গ্রেপ্তার হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর থাকে কড়া পুঁজিশী নজর, তাদের প্রতিটি গ্রিয়াকলাপ লেখা থাকে গোপন ফাইলে, কম্পিউটারের স্মৃতিতে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তি, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রার্থীদের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ পুঁজিশ বাহিনী। পুঁজিশের সাধারণ ব্যাটন

ছাড়াও ওদের হাতে থাকে টিয়ারগ্যাস গ্রেনেড-লগ্নার, রাস্তার উপর সাবানের ফেনার আস্তর ছাড়ানোর যন্ত্র, হেলিকপ্টার থেকে লোকের উপর ছুড়ে দেওয়ার জাল, দমদম বুলেট ছোড়ার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, এমনকি ট্যাংকও। তা ছাড়া, ওই দেশে তথাকথিত আইনভঙ্গ দমনের জন্য প্রায়ই নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও রক্ষিবাহিনী তলব করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অর্থাৎ নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারটি কিছুটা উন্নত কি? মোটেই না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বর্তমান বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ: সর্বক্ষণ কড়া পুলিশী নজর, একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার উপর যদৃচ্ছা হামলা, অধিকার ও স্বাধীনতার কঠোর লঙ্ঘন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে মার্কিন নাগরিকদের সম্বন্ধে ৩.৫ বিলিয়ন ফাইল, তাতে প্রায়শই থাকে উপার্জন, সার্ভিস-রেকর্ড, অভ্যাস, রাজনৈতিক সহানুভূতি ও বিদ্বেষ, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপে শরিকানা সহ পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণী। কম্পিউটার, টেলিফোন-টোপিং, বাড়িতে আড়ি পাতা, ক্ষুদ্রে টেপরেকর্ডার ও লুকান ক্যামেরার ব্যাপক প্রয়োগের দৌলতে আজকাল এসব তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেসিং খুবই সহজ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের এবং অস্ব-প্রতিযোগিতা অবসানের পক্ষে, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে,

নারীর সমানাধিকারের পক্ষে আন্দোলনকারী ও ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীদের উপর বিশেষ কড়া নজর রাখা হয়।

জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে কম্পিউটারের স্মৃতি-ফাইলে ধৃত আছে পশ্চিম জার্মানির ৫ কোটির বেশি নাগরিকের তথ্যপঞ্জি। অতএব, শোভাযাত্রায় শরিকদের তথ্যাদি থাকে ফেডারেল ফৌজদারি অনুসন্ধান বিভাগের হাতে, অর্থাৎ শোভাযাত্রায় শরিক হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ পদূলিশের নজরে পড়া অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং অতঃপর কী ঘটবে তা অনুমান খুব কঠিন নয়। মানুষের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ পুরো নজরে রাখা ও কোর্ট কোর্ট মানুষের জন্য গোপন ফাইল রাখা অন্যান্য পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশেরও সাধারণ রেওয়াজ।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি কীভাবে ব্যবহার করে?

পেশার উপর নিষেধাজ্ঞা অনেক পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশেই গোপনে বা প্রকাশ্যে চালু আছে এবং তার অর্থ ‘র্যাডিকাল মতাবলম্বীদের’ সরকারী চাকুরিতে (যেমন রেলগার্ডের ড্রাইভার, শিক্ষক, প্রভৃতি) নেওয়া হয় না। বেসরকারী কোম্পানিগুলি বামপন্থী মতের লোকদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত বা চাকুরি দিতে অস্বীকার করতে পারে এবং এদের মধ্যে থাকে মেহনতিদের অধিকার ও শান্তির সপক্ষে অটল সংগ্রামীরা, সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতীরা।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে শুনানির

জন্য লোকদের বিশেষ কমিশনের সামনে তলব করা হয়, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কে তাদের মতামত জানার জন্য জেরা চলতে থাকে এবং কমিশনের মনে একবার ‘সন্দেহ’ জাগলে তা খারিজ করান খুবই কঠিন, প্রায়শ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা লোকাঁটি যাই বলুক না কেন। ফল দাঁড়ায় চাকুরি না-পাওয়া। মাঝেমধ্যে লোকদের তাদের ফাইলে গোয়েন্দা বিভাগের সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়। কীজন্য প্রগতিশীল লোকদের পশ্চিম জার্মানিতে চাকুরির সুযোগ দেওয়া হয় না এখানে তার কয়েকটি মাত্র হেতু উল্লিখিত হল: গণতান্ত্রিক সংগঠনের আয়োজিত উদ্যোগে শরিকানা, অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিতরণ, চিলির জনগণের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা, আন্তর্জাতিক সংহতির আন্দোলনে যোগদান।

প্রগতিশীল মতামত যারা প্রকাশ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কতৃপক্ষ কখন কখন ‘পর্যায়িক সন্ধান’ কাজে লাগায়। তাতে থাকে ব্যক্তিগত একটি ফাইল চালু করা, পদোন্নতি থামান, ব্লাকলিস্টিং সহ বরখাস্ত, ভীতিপ্রদর্শন ও বানোয়াট অভিযোগে গ্রেপ্তার।

প্রগতিশীল মতের লোকদের ‘প্রাচুর্যের সমাজ’ নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় থেকে এবং কখন কখন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বসবাসের সম্ভাবনা থেকেও বঞ্চিত করে।

দমনমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি একচেটিয়া বুদ্ধিজীবী গণমাধ্যমগুলির — টিভি, রেডিও ও সংবাদপত্রের —

সাহায্যে মগজ-খোলাইয়ের ব্যবস্থাটিও নিখুঁত করে তুলছে। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার জন্য তারা নেশাদ্রব্য ও সুদূর কাজে লাগায়, নানা ধরনের উপ-সম্প্রদায়কে মদত যোগায়, অবাধ যৌনাচার ও বিবিধ সন্দেহজনক বিনোদনের ধারণা প্রচার করে। ধন-কুলেরদের দৃঢ় বিশ্বাস — কঠিন ও কোমল কৌশলের সঠিক মিশ্রণে সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়ারা রাজনৈতিক জীবনে বর্ধমান পরিসরে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী হয়ে উঠছে। লেনিন একদা বলেছিলেন, ‘সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতেও যথার্থই সন্ত্রাস ও বুদ্ধিজীবী একনায়কত্ব বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেক বারই সেগুলি খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করেছে যখনই শোষণের ভাবে যে পুঁজির ক্ষমতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।’*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এখন একটি সর্বিশেষ কার্যকর হামলা চালান হচ্ছে, তাতে চরম দক্ষিণপন্থী ও প্রায়ই ফ্যাসিস্ট ধরনের সংগঠনগুলির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা

* V. I. Lenin, ‘First Congress of the Communist International. March 2-6, 1919. Theses and Report on Bourgeois Democracy and the Dictatorship of the Proletariat, March 4’, *Collected Works*, Vol. 28, 1977, p. 462.

করা হয়, এবং সরকারগুলির কর্মনীতির উপর তাদের প্রভাব এখন অত্যধিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চরম দক্ষিণপন্থীদের বর্তমান আক্রমণকে প্রায়ই নব্য-ম্যাকার্থিবাদ নামে সনাক্ত করা হয়। ১৯৪০-র দশকের শেষ ও ১৯৫০-র দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ‘ঠান্ডা লড়াইয়ে’ ঝাপ দেয়, দেশে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক বিরাট ‘কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের’ জালে জড়িত — উইসকন্সিন রাজ্যের সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থি তা প্রমাণে উদ্যোগী হন। তাঁর কর্মনীতিতে ছিল তথাকথিত দেশদ্রোহী সন্ধান, প্রকাশ্য ফ্যাসিস্ট দঙ্গলগুলির জাঁকাল সমাবেশ, উদারপন্থী কংগ্রেসম্যান, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের উপর বর্বর হামলা, প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলির উপর অবৈধ নিপীড়ন। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চরম দক্ষিণপন্থীদের আন্দোলন একই পরিস্থিতিতে, অভিন্ন লক্ষ্যে এগচ্ছে। তাই সিনেট গঠন করেছে ‘নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ সংগ্রান্ত’ একটি সাব-কমিটি এবং তা একদা ‘অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিটি’ ও ‘ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড’ নামের সরকারী সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ‘ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্তদের’ বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করত, সেগুলিরই কয়েকটি পুনরুজ্জীবিত করেছে। সরকারীভাবে অনুমোদিত টেলিফোন-টোপিং ও নজর-রাখার ব্যাপারগুলি এখন বেড়েই চলেছে।

চরম দক্ষিণপন্থীদের স্লোগান বৃহৎ ব্যবসায়ের শ্রেণীস্বার্থেরই হুকুম তামিল করে, যেসব স্লোগানে থাকে নগ্ন বর্ণবাদ, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, উন্মত্ত কমিউনিজমবিরোধিতা ও সমরবাদ। চরম দক্ষিণপন্থী আন্দোলন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রবল রাজনৈতিক শক্তি এবং তাতে আছে কু-ক্লক্স-ক্লান, নার্সিস দঙ্গল, বর্ণবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী আর ‘মার্কিন রক্ষণশীল ইউনিয়ন’, ‘জন বাচ’ সোসাইটির’ মতো সংগঠনগুলি, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, সাময়িকী, প্রকাশনা সংস্থা।

সাম্রাজ্যবাদের দেশিক ও বৈদেশিক নীতিগুলি প্রতিক্রিয়াপূর্ণ, এগুলির ভিত্তিতে রয়েছে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বিস্তার, পারমাণবিক ব্রেকমেইল, জাতীয় মনুষ্টি আন্দোলন দমন ও বিশ্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি একটি আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলে অথচ দেখায় যেন অন্যান্য দেশের ‘গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা’ সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের অন্ত নেই। ওয়াশিংটনের ‘স্বাধীনতার বন্ধুরা’ বলে যে গ্রেনাডার বিরুদ্ধে নিরলস আক্রমণ আসলে ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার’ ছাড়া আর কিছু নয়। এল-সালভাদর, লেবানন ও আফগানিস্তানে নগ্ন হস্তক্ষেপের অজুহাত হল সেইসব দেশে ‘স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ রক্ষা। এদেরই সমর্থনপূর্ণ ও অস্ত্রসজ্জিত দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, চিলি ও এল-সালভাদরের একনায়কত্বগুলি প্রকাশ্যেই নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও ব্যাপক নির্যাতন চালায়।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সরকারী মহল শাস্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ, বন্দিশিবির, আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না-দেখিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্বিশেষ ধ্বংসের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ও তার সমর্থক। ওয়াশিংটন জনগণবিরোধী একনায়কত্বগুলিকে রক্ষা করার কাজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলে মনে করে।

তাই, গত শতাব্দীর শেষে এবং এই শতকের গোড়ার দিকে উদ্ভূত একচেটিয়ারা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তা মেহনতিদের শোষণ বৃদ্ধির ও বুদ্ধিজীবীর আরও ধনদৌলত বৃদ্ধিতে সহায়তা বৃদ্ধি করে, তাকে আরও পরজীবী করে তোলে। একচেটিয়াদের প্রাধান্যের মধ্যে রাজনীতির গোটা ধারায় প্রতিফলিত বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিতে অবক্ষয় ও পরজীবিতা খুবই সহজলব্ধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন: একচেটিয়া অক্টোপাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। মূলত নতুন ধরনের একচেটিয়া ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে তা সম্পর্কিত।

ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন বা টি এন সি কী? পুঞ্জিতান্ত্রিক বিশ্বের জনগণের উপর সেগুলির কার্যকলাপের ফলাফলই-বা কী?

১। বিশ্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যগুলি

পশ্চিমে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই নতুন ধরনের একচেটিয়াদের নানা নামে অভিহিত করেছেন: বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক, ট্রান্সন্যাশনাল, মহাজাতিক, বৈশ্বিক, ইত্যাদি উদ্যোগ, ফার্ম, কর্পোরেশন ও কোম্পানি। কারও মতে টি এন সি সেই ধরনের উদ্যোগ যাদের

অন্য দুই বা ততোধিক দেশে অনুপূরক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্যান্যরা গুরুত্ব দেন এগুলির সাংগঠনিক কাঠামোর খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য, আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা সংক্রান্ত কোম্পানিগুলির ম্যানেজারদের আচরণ ও চিন্তাভাবনা, তাদের সম্পত্তির আয়তন (লেনদেনের অঙ্ক ১০ কোটি, ৩০ কোটি বা ততোধিক ডলার), বিদেশস্থিত অনুপূরক উদ্যোগের সংখ্যা ও অন্যান্য অবিমিশ্র গুণগত সূচকের উপর।

কিন্তু খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে টি এন সি-র সবগুলি ব্যাখ্যার কোথাও এগুলির একচেটিয়া বৈশিষ্ট্যের কোনই উল্লেখ নেই এবং বস্তুত খোদ 'একচেটিয়া' শব্দটির ব্যবহারও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অগ্রগণ্য এইসব পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থাকে বিদেশী অনুপূরক ও শাখা প্রতিষ্ঠান সহ হাজার হাজার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সহ) মিলিয়ে ফেলার এইসব প্রচেষ্টার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হল গোটা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে শৃঙ্খলিতকারী এইসব একচেটিয়া দৈত্যগুলির কার্যকলাপ লুকিয়ে রাখা, তাদের শোষণমূলক প্রকৃতি আড়াল করা।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের কার্যকলাপে নিয়ন্তৃত্ব বৃহৎ সংখ্যক কোম্পানির মধ্যে এখন বৃহত্তম কর্পোরেশনের একটি ক্ষুদ্র দল প্রাধান্য পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র দলটির আছে প্রবল অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ, যা কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে তাদের নিরঙ্কুশ

আধিপত্য নিশ্চিত করে। এই ধরনের প্রতিটি কর্পোরেশনই কার্যত একটি বিস্তারমান, বিশ্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতো ১৯৮০-র মধ্যদশকে ৩৫০টি প্রধান টি এন সি-র বার্ষিক মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি, সেগুণিতে কাজ করছিল প্রায় ২.৫ কোটি লোক, যা উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের প্রসেসিং শিল্পে নিযুক্ত মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই কর্পোরেশনগুলির বিদেশস্থ অনুপদ্রক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩ হাজারের বেশি। ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির কলকারখানায় সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হয়। হিসাব করা হয় যে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোট জাতীয় উৎপাদে টি এন সি-র অংশভাগ দাঁড়াবে ৪০ — ৫০ শতাংশ। ২০০০ সাল নাগাদ প্রায় ৩০০ মূখ্য কর্পোরেশন কার্যত বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির গোটা ব্যবসায়ী পরিচালনা করবে।

টি এন সি হল উৎপাদন ও পুঁজি ঘনীভবনের একটি নতুন পর্যায়ের নিদর্শন। এগুলি আসলে একচেটিয়া অর্থনৈতিক সমাহার, যাতে যুক্ত রয়েছে উৎপাদন, ফিনান্স ও প্রশাসনিক বন্ধনের একটি সুদৃঢ়প্রসারী জটিল প্রণালীতে নানা পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অনুপদ্রক প্রতিষ্ঠানগুলি। এগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য: উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের এবং শ্রমশক্তি শোষণের প্রক্রিয়ায়

তাদের সক্রিয় শরিকানা। টি এন সি হল উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে নিষ্পত্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যারা পুঁজির মালিকানার ব্যাপারে মূলত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাই, 'জেনারেল মোটরস' একটি মার্কিন টি এন সি, 'ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম' একটি ব্রিটিশ এবং বি এ এস এফ একটি পশ্চিম জার্মান টি এন সি।

শিল্প টি এন সি ও ব্যাংকিং টি এন সি একযোগে দেশ ও বিদেশে কর্তৃত্ব করে। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকগুলিতে টি এন সি ব্যাংকগুলি তাদের কার্যকলাপ অত্যধিক বৃদ্ধি করার সময় বাহামাস ও সায়মান্স দ্বীপ তাদের কার্যকলাপের জন্য খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং সেখানকার মার্কিন ব্যাংকগুলির স্থানীয় অনুপদ্রক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় মার্কিন ব্যাংকের ষাবতীয় অনুপদ্রক প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের চেয়ে বেশি। করমুক্তির স্বর্গ এই বাহামাস ও সায়মান্স টি এন সি ব্যাংকগুলিকে সম্পূর্ণ লাগামহীন অবস্থায় ও ন্যূনতম খরচায় সারা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে মহাজনী কারবার চালাবার দারুণ সুযোগ দিয়েছিল।

শিল্প ও ব্যাংকিং টি এন সি এখন অধিকাংশ ফিনান্স গোষ্ঠীর কোষকেন্দ্র হয়ে উঠেছে এবং এগুলির মাধ্যমে এই মহাজনগোষ্ঠী পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের অনেকগুলি দেশের অর্থনীতি ও প্রায়শই রাজনীতির উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাচ্ছে।

২। দেশের চেয়ে বিদেশ আরও ভালো কেন?

টি এন সি কীজন্য বিদেশে তাদের পুঁজিলগ্নি ও জাতীয় সীমানার বাইরে শিকড় বিস্তারের উদ্দেশ্যে হন্যে হয়ে পৃথিবী পাড়ি দেয়? এটা কী সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা উত্তরণে সাহায্যদান, তাদের জন্য সুবিধা সৃষ্টির ভাবনা বিদেশের খদ্দেরদের তুষ্টিবিধানের সদিচ্ছাপ্রসূত বা অনুরূপ কোন পরার্থবাদী হেতুজনিত? মোটেই না।

টি এন সি-র মালিক ও পরিচালকবর্গ 'সোনার চাকচিক্য' ও ব্যাংকনোটের মর্মরশব্দে প্রলুব্ধ হয়েই এই উদ্যোগে রতী হয়। অবশ্য তারা নিজেরাও একথা গোপন করে না যে বিদেশে তাদের মহাজনী কারবারের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাবাফালাভ।

দেখা গেছে, বিদেশে পুঁজি রপ্তানি অত্যন্ত লাভজনক এবং তা এজন্য যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমশক্তি প্রায়শ খুবই সস্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল বা অনুপস্থিত। এইসব দেশে পাওয়া যায় সস্তা কাঁচামাল, কোন কোন পণ্যের সুবিধাজনক বাজার। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমিকদের বেতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকর্মীদের একটি ভগ্নাংশ মাত্র, ধর্মঘট বেআইনী এবং কর্ম-দিবস পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম — বিদেশী একচেটিয়াদের জন্য একটি প্রকৃত স্বর্গ!

টি এন সি-র বিদেশযাত্রা ও সেখানে পুঁজি রপ্তানির অন্যতর কারণও অবশ্য আছে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাজারে অনুপ্রবেশ, যৎসামান্য নিজ তহবিল ব্যয়ে ও স্থানীয় ঋণসংগ্রহের কল্যাণে বিদেশে ব্যাপক পুঁজিলগ্নি, আন্তর্জাতিক মাত্রায় উচ্চ-প্রযুক্তির জন্য ইচ্ছামতো অর্থনিয়োগ, অন্যদের কৃৎকৌশল উদ্ভাবনে অনুপ্রবেশ এবং বিপণনের ব্যাপক জাল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাসৃষ্টি সম্ভব। টি এন সি-র বৈদেশিক অনুপ্রবেশ প্রতিষ্ঠানগুলি আসলে ট্রয়ের ঘোড়া, যার সাহায্যে তাদের পণ্যগুলি শুল্কবিভাগ ও অন্যান্য যাবতীয় বাধা এড়াতে পারে।

টি এন সি কর্তৃক পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের দেশগুলি লুটের কোন পূর্ণাঙ্গ হিসাব আছে কি? এই ধরনের লুণ্ঠন অত্যন্ত বহুমুখী বিধায় তা কঠিন হলেও আনুমানিক কিছু ধারণালাভ অসম্ভব নয়। ১৯৮০-র মধ্যদশকে প্রধান ৩০০টি টি এন সি-র বার্ষিক নীট মুনুফার অঙ্ক ছিল ১০০ শতকোটি ডলারের বেশি এবং মোটামুটি এর এক-তৃতীয়াংশ এসেছিল বিদেশ থেকে। অতীতের মতো মার্কিন টি এন সি এর মোটা অঙ্কটি পায়, যাদের বৈদেশিক মুনুফা তাদের বার্ষিক প্রত্যক্ষ লগ্নির চেয়ে বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা যতটা প্রত্যক্ষভাবে লগ্নি করে তা থেকে বার্ষিক দেড় গুণ বেশি মুনুফা হিসাবে তুলে নেয়।

এইসব তথ্য থেকে বিদেশে টি এন সি-র শোষণমূলক ও লুণ্ঠনজীবী নীতি খুবই সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে।

৩। টি এন সি-র বৈদেশিক সম্প্রসারণের অর্থনৈতিক ফলাফল

টি এন সি বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন, বাণিজ্য এবং বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির বৃহত্তর অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সেজন্যই পুঁজিতন্ত্রের অধীনে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপকতর সাধারণ অস্থিরতার একটি প্রধান হেতু হিসাবে সক্রিয় থেকে ওগদুলি গোটা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর নিয়ত প্রসারমান ও বর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন গভীরতর করে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ বৃদ্ধি করে, ওগদুলি বিকাশমান উৎপাদন শক্তি বিকাশের মাত্রা ও উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্যকার সংঘাতকে তীব্রতর করে তোলে। আসলে টি এন সি হল মনুষ্টমের ব্যক্তির হাতে বিপুল পরিমাণে ঘনীভূত অর্থনৈতিক শক্তি। উৎপাদন বর্ধমান হারে সামাজীকীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বৈষয়িক সম্পদের ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাতের পূরনো ভিত্তি টিকেই থাকে। টি এন সি-র বিকাশ সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত আত্মসাতের মধ্যকার অসঙ্গতি বাড়ায় এবং একালের পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধকে আরও শাণিত করে তোলে।

পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন শক্তির বিকাশের অসঙ্গতি থেকে যথারীতি উদ্ভূত টি এন সি এইসব সাময়িক, আংশিক ও অসম্পূর্ণ যার বাড়িতে দেয়, কিন্তু সেগদুলি সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যের

হয় না। এখন উচ্চ-প্রযুক্তির বিষয় আলোচনা করব।

টি এন সি বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্যগুলির সুফল আহরণে অসংখ্য বাধা সৃষ্টি করে, ফলত সেগুলির পূর্ণ সদ্যবহার কঠিন হয়ে ওঠে। উদ্ভূত-মূল্যের অব্যাহত নিষ্কাশন ও সর্বোচ্চ মুনীফা সংগ্রহ পূর্জিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল লক্ষ্য বিধায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রগতি গোটা সমাজের সুবিধার্থে প্রযুক্ত হয় না, এগুলি ব্যবহৃত হয় প্রধানত আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পূর্জি ও ধনকুবেরতন্ত্রের নির্ভেজাল ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলে।

টি এন সি যথারীতি কেবল উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস ও মুনীফা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতেই নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কিন্তু প্রায়শই উৎপাদন পুনর্গঠন ও নতুন প্রণালী প্রবর্তনে উৎসাহ দেখায় না, কারণ নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির এই বাড়তি খরচা ছাড়াও তারা মুনীফা বাড়াতে পারে। তারা উচ্চ-প্রযুক্তি ও নতুন ধরনের উৎপাদ উদ্ভাবনে সক্রিয় থাকলেও এগুলির অধিকাংশই দীর্ঘকাল ফাইলে আটকা পড়ে থাকে এবং কখনো কখনো উৎপাদনে মোটেই ব্যবহৃত হয় না। এইসঙ্গে ট্রান্সন্যাশনাল গোষ্ঠীগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্ভাবন থেকে যথাসম্ভব দীর্ঘ কাল দূরে রাখার জন্য চেষ্টার কোনই কসর করে না।

কম গবেষণা, উন্নয়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যয়বৃদ্ধির পান। তারা এমনকি বৃহত্তম কর্পোরেশনগুলিও প্রায়শই প্রতিপাদন করে যে সব গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বসবাসের জন্য ভজনক ও যাতে দ্রুত মুনীফা

পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক চাহিদা পূরণের বদলে নানা ধরনের বাজার-চাহিদা মেটানোর লক্ষেই মূলত বিজ্ঞানের বিকাশকে পরিচালিত করে। টি এন সি তাদের একচেটিয়া মুনোফা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য দেশ ও বিদেশে কৃত্রিমভাবে মৌলিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির গতিবেগ হ্রাস করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত: তেল টি এন সি দীর্ঘকাল শক্তির ভিন্নতর উৎস উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রহত করেছিল; অগ্রণী মোটর কর্পোরেশনগুলি পেট্রোল ছাড়া অন্যতর কোন জ্বালানি (ধরুন, গ্যাস) চালিত মোটর-ইঞ্জিন উদ্ভাবনে বাধা দিচ্ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব এবং উৎপাদনী শক্তির বর্তমান উন্নীত স্তরের সঙ্গে মোকাবিলায় ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া পুঁজির ব্যর্থতার একটি উজ্জ্বল নজির হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে বর্ধমান হারে অস্ফ-উৎপাদনে ব্যবহার।

ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়ারা এখন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রধান পুঁজি-রপ্তানিকারী এবং পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই দাবি করেন যে ওরা নাকি 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নতিতে চমৎকার দক্ষ এক চালিকাশক্তি হিসাবে সক্রিয়'। তাঁরা আমদানিকারী দেশের পক্ষে পুঁজি রপ্তানির নেতিবাচক ফলাফল লঘু করার বা এমনকি পদরোপড়ার আড়াল করার প্রয়াসও পান। তাঁরা এই উপমা সহকারে একচেটিয়ার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে চান: ভাড়াটিয়া যেমন অন্যের বাড়িতে বসবাসের জন্য ভাড়া দেয়, সেভাবে বিদেশী অনুপদ্রক

প্রতিষ্ঠানের পুঁজি থেকে গ্রহীতা দেশের পাওয়া
সুবিধার বিনিময়ে কিছুটা মূল্যদান তার কর্তব্য বৈকি।

পুঁজি রপ্তানিতে অনেকগুলি দেশের জাতীয় শিল্পের
বিকাশকে মন্থর করা হয়। কোন দেশে একবার টি এন
সি-র অনুপ্রবেশ ঘটলে তেলের দাগের মতো সর্বত্র
ছড়াতে থাকে, গোত্রাসে দৃশ্যমান সর্বাক্ষু কিনি ফেলে,
অর্থনীতির লোভনীয় অংশগুলি কুড়িয়ে নেয়। এই
বিদেশী শকুনগুলি আরণ্যক নিয়মে পরিচালিত হয়:
লাঠি যার মাটি তার। মূল শিল্পগুলিতে একবার
দৃঢ় অবস্থান নিলে এবং আয়ত্তাধীন যাবতীয় উপায়ে
নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত উর্গাটি ছড়াতে পারলে সে এইসব
শিল্প থেকে জাতীয় পুঁজিকে অনিবার্যভাবে দূরে
রাখে, ফলত তা নিজের, দেশীয় বাজারে পুঞ্জীভূত
হতে থাকে। এইসবই জাতীয় উৎপাদনী শক্তির
বিকাশকে মন্দীভূত করে।

টি এন সি-র বর্জ্যে সাফাইদাররা জোরগলায়
চেঁচায় যে, একচেটিয়ারা পুঁজি-আমদানিকারী দেশে
কেবল বাড়তি পুঁজিই নয়, নানা ধরনের কৃৎকৌশলগত
ও সাংগঠনিক নতুনত্বও আনে, আর এইসবই নাকি
জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়তা যোগায়। কিন্তু আসলে
টি এন সি লাঠির জোরে স্থানীয় উৎপাদকদের সর্বাপেক্ষা
লাভজনক ও প্রগতিশীল শাখা ও অর্থনৈতিকভাবে
বিকশিত অঞ্চল থেকে উৎখাত করে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে টি এন সি সম্পূর্ণ নিজস্ব
স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং যদৃচ্ছায় যেকোন সময়
অপ্রত্যাশিতভাবে উৎপাদন গুটিয়ে ফেলতে ও স্থানীয়

প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারে, এবং তাতে জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন অসুবিধা ও অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টি এন সি দক্ষ কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশীদের প্রলুব্ধ করে (খোদ এতেই স্থানীয় বাজারে শ্রমশক্তির সমস্যা জটিলতর হয়), কিন্তু শিল্পোৎপাদনে সংকট বা মন্দা ঘটলে তাদের পরিপূরক ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি হাজার হাজার কর্মী ছাটাই করে দেয় ও তারা বেকারবাহিনীর বৃদ্ধি ঘটায়।

টি এন সি-র কার্যকলাপ অনুরূপভাবে দেশের লেনদেনের উদ্ভূতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কেননা বিপুল পরিমাণ অর্থ বিশাল তরঙ্গের মতো নানা দেশের টি এন সি পরিপূরক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেশের সীমান্ত পেরিয়ে গড়িয়ে চলে ও এভাবে দেশের প্রচলিত মদ্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে, বিনিময় হারে তীব্র ওঠা-নামা, ইত্যাদি ঘটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, ব্রিটেন আর অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির টি এন সি উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির উপর বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিষয়টি নয়া-উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

৪। ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন:

বিপদ না প্রতিশ্রুতি?

টি এন সি-র কার্যকলাপ মেহনতিদের ব্যাপক স্তরের স্বার্থবিরোধী এবং পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকাংশ

মানুষের পক্ষে অসুয়ক, কেননা ওগদুলি শ্রমিক ও কৃষক, খামারী ও দোকানদার, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়র, বিজ্ঞানী ও লেখক সকলকেই নির্মমভাবে শোষণ করে। নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্যে, অতৃপ্ত অর্থলোভের তাড়নায় তারা এমনসব ভোগ্যপণ্য গছাতে থাকে যেগুলি তাদের জন্য লাভজনক কিন্তু খন্দেরদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয়, এমনকি প্রায়শই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

টি এন সি নাজিরবিহীন পরিসরে অস্প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, যাতে রয়েছে ব্যাপক নরমেধের অস্প্রশস্ত উদ্ভাবন ও পরীক্ষার মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপ।

লক্ষণীয়, একচেটিয়ারা আপন মুনোফার স্বার্থে মানুষের জান-মাল ধ্বংসে উদ্যত হলেই টি এন সি এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের স্বার্থের মধ্যকার সংঘাত সবিশেষ তীব্র ধরনে প্রকটিত হয়ে ওঠে।

মার্কিন 'ফায়ারস্টোন' কর্পোরেশন এক ও অভিন্ন ধারণা জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে একদা প্রচার চালিয়েছিল: আমরা সবার সেরা ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টায়ার প্রস্তুত করি। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র ছড়ান বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে সম্ভাব্য খন্দেরদের আশ্বাস দেয়া হয় যে হালকা মোটরগাড়ির জন্য, অরীয় ৫০০-টায়ার সম্পূর্ণ নিখুঁত ও প্রত্যেকের আদর্শ টায়ার।

কয়েক বছরের মধ্যে সরল-বিশ্বাসী খন্দেররা ১০ লক্ষের মতো 'ফায়ারস্টোন' টায়ার কেনে এবং ব্যবসায়ী জগতে এমন প্রতারক প্রচারণা ব্যতিক্রমী না হলেও ৫০০-টায়ার

কেলেস্কারি শেষাবধি আন্তর্জাতিক পরিসর লাভ করে। দেখা যায় যে এইসব টায়ারের জন্য হাজার হাজার মোটরগাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং একচেটিয়া এই প্রকাশ্য কেলেক্কারি ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বহু দেশের সংবাদপত্রে মোটরগাড়ির দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতেই ৫০০-টায়ার সংক্রান্ত ২৫০টি বড় ধরনের মামলার শুনানি চলে। মোটর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মার্কিন কেন্দ্র অতঃপর 'ফায়ারস্টোনকে' তাদের বিজ্ঞাপন তহবিলের একাংশ টায়ারের অধিকতর মানোন্নয়নে খরচ করতে বললে একচেটিয়া অর্ধেক দামে টায়ারের ব্যাপক বিক্রয় শুরু করে। শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইসব টায়ার বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে একচেটিয়া সেগুর্লি বর্জ্য-দরে পশ্চিম ইউরোপ ও উন্নয়নশীল দেশে বিক্রি করে ফেলে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যান্য দেশে (নিজ দেশে নিষিদ্ধ হলে) টি এন সি নিম্নমানের ওষুধ, শিশুখাদ্য, টিভি-টিউব ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় করেছে। কেবল লাতিন আমেরিকার দেশেই মার্কিন একচেটিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ শতাধিক ধরনের ওষুধ বিক্রি করেছে। বিদেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ওষুধের নিয়মিত বিক্রেতা টি এন সি উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করে। লক্ষণীয়, অপরাধকল্প এই ধরনের সমাজবিরোধী নীতি আসলে টি এন সি-র স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার।

অতি-মুনাফার তাড়নায় ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া

নগ্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালানায় কখনই পিছ-পা হয় না।

১৯৮৪ সালের শেষের দিকে মার্কিন টি এন সি 'ইউনিয়ন কার্বাইড' ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালকে একটি গণসমাধিতে পরিণত করেছিল এবং বলা বাহুল্য তা মানবজাতির স্মৃতিতে চিরদিন এক ট্র্যাজেডি ও বর্বরতার প্রতীক হয়ে থাকবে। হস্তা গ্যাস, মিথাইলিসোসায়নাইট ও ফস্‌জেন ওই 'ইউনিয়ন কার্বাইডের' কারখানা থেকে বেরিয়ে আড়াই হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটায়, তাতে হাজার হাজার জনের চক্ষু, কিডনি ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের বেশি।

ভারতবর্ষে 'ইউনিয়ন কার্বাইড' ট্র্যাজেডি কোন আপাতক ব্যাপার নয়, কেননা তা ঘটেছিল একটি উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থে প্রতি টি এন সি-র অপরাধমূলক অবহেলার দরুন। একচেটিয়াটি এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসায় নি, যা থাকলে সহজেই বিপর্যয়টি ঠেকান যেত। অথচ তাতে খরচা হত মুনামার এক অতিস্কন্ধ ভগ্নাংশ। ব্যাপার হল, আগেও এই কারখানায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রাণহানি ঘটেছিল এবং স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিষাক্ত গ্যাস নিগম সম্পর্কে 'ইউনিয়ন কার্বাইড' ব্যবস্থাপনাকে বার বার হুঁশিয়ার করেছিল।

কোন কোন পশ্চিমা ব্যবসায়ী এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কল্পনাতীত অসুয়ক ধরনের মন্তব্য করেছেন: 'ভারত সভ্যতার দেনা পরিশোধ করছে' — এই হল তাঁদের

দাঁবি। এই ধরনের সভ্যতা, অনেকটা নাৎসিদের তৈরি ‘সভ্যতার’ মতোই বিকৃত, সব বিষাক্ত সামগ্রী পরীক্ষার জন্য মানুষকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করেছিল। এই অমানবিক অপরাধের পর ‘ইউনিয়ন কার্বাইড’ চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসা ভারতীয় ডাক্তারদের পথ আটকে রাখে, অথচ তাতে গ্যাসের মারাত্মক বিস্ফোরণ থেকে আত্মসত্তা সাহায্য পেতে পারত। একচেটিয়াদের উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপকদের মনোভাবের ধরনটি এতে আরেকবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একচেটিয়াদের আরেকটি অপকর্ম উল্লেখ্য। ১৯৮০-র দশকের প্রথমার্ধে মার্কিন রাসায়নিক গোষ্ঠী ‘ডাও ক্যামিকাল’ ও পেণ্টাগনের বর্বর এক পরীক্ষায় প্রাণ হারায় আমাজন নদীর অঞ্চলে রেড-ইন্ডিয়ানদের তাকুন্দা ও তুপি-গুয়ারিনি উপজাতির হাজার হাজার মানুষ।

দুটি রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী কুলের এমন অপূরণীয় ক্ষতি ঘটেছিল যে কেবল আমাজন অববাহিকায় পাওয়া যায় এই ধরনের ২৫ হাজার অনন্য প্রজাতি লুপ্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

প্রগতিশীল বিশ্বজনমত এই অপরাধমূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেছিল এবং অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠন, প্রখ্যাত আইনজীবী, চিকিৎসক, জীববিদ ও পরিবেশবিদরা এই ধরনের বর্বরোচিত রাসায়নিক অস্ত্রপরীক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন।

দেশে ও বিদেশে উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারী ও

রাজনীতিকদের ঘুসদান টি এন সি-র ব্যাপক আচরিত অন্যতম কুকর্ম এবং এগুটির অনেকটাই এই ষড়যন্ত্রের হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ‘বোয়িং’ একচেটিয়া বিদেশে মোট ৪ কোটি ডলার ঘুস দেওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু সে তার কুকর্মের গোটা বহরটি খোলসা করে নি, কেননা মার্কিন নিরাপত্তা বিনিময় কমিশনের হিসাবমতো ঘুসের মোট অংকটি ছিল ৮ কোটি ডলারের বেশি। মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশের বিমান কোম্পানির জন্য ‘বোয়িং’ বিমান ক্রয়ের ব্যাপারে ওই একচেটিয়া তার দালালদের মাধ্যমে আরব শেখদের ও অন্যান্য উত্তমর্গের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণগ্রহণের সুবিধা আদায় করেছিল। একই মধ্যগদের মাধ্যমে একচেটিয়া অন্যান্য দেশেও একইভাবে পণ্যবিক্রয়ের জন্য প্রভাবশালী পার্টি ও সংগঠনের নেতাদের ঘুস দিয়েছিল।

ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়ারা বিদেশে হামেশাই এই ধরনের বিপণন কৌশল খাটায় এবং কার্যত তা গতানুগতিক হয়ে উঠেছে, কেননা ওগুটির ‘বার্ণিজ্যিক আচরণের’ নিয়মভুক্ত। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে অনেকগুটি বড় বড় কলেঙ্কারির প্রেক্ষিতে তারা বিদেশে তাদের কার্যকলাপ গোপন করার পথ খোঁজে ও ফ্রন্ট-কোম্পানিগুটির মাধ্যমে এই কার্যসমাদার প্রয়াস পায়।

যেমন যেসব দেশে টি এন সি গড়ে ওঠে তেমন পুঁজি-আমদানিকারক দেশগুলিতে রাজনৈতিক

প্রতিদ্বন্দ্বীর বৃদ্ধি হল গোষ্ঠীগগুলির বর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলি হাত করার ব্যাপারটি সর্বশেষ উল্লেখ্য। একচেটিয়ারা স্থানীয় সংবাদপত্র, টিভি ও বেতার-স্টেশনের তুলনায় সারা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় সংবাদপ্রচারে সমর্থ প্রধান প্রধান সাময়িকী, প্রকাশালয়, বেতার ও টিভি সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী। এইসব গণমাধ্যম টি এন সি-র পণ্যগুলি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলির অনুরূপ পণ্যের চেয়ে এগুলির শ্রেষ্ঠতার যথার্থ বাছবিচার না করেই খন্দেরদের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। এই মাধ্যমগুলি অপয়োজনীয় পণ্যত্রয়ের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয় ও একচেটিয়াদের কার্যকলাপের অনুরূপে জনমত গড়ে তোলে। বিজ্ঞাপন প্রচার ছাড়াও গণমাধ্যমগুলি টি এন সি-র সরাসর নিয়ন্ত্রণে সারা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় তাদের ভাবাদর্শ, মতামত ও জীবনধারা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। এভাবে সাময়িক-শিল্প গোষ্ঠীগগুলি যুদ্ধের আবহ ও কমিউনিস্টবিরোধী উন্মত্ততা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমগুলি কাজে লাগায়।

ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়ারা বিভিন্ন দেশের প্রতিদ্বন্দ্বীশীল পার্টি ও রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী প্রচারে অর্থ যুগিয়ে বা শুধু ঘুস দিয়ে ওদের সঙ্গে, বিশেষত সাময়িক ও সাময়িক-শিল্প চক্রগুলির সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ বাড়িয়ে চলেছে।

ইদানীং অসম্ভবব্যবসায়ে অধিকাংশ টি এন সি-র বর্ধমান ঝুঁকিগ্রহণের মূলে রয়েছে প্রধানত বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকটের ঘটনা, বেসামরিক শিল্প থেকে অতি-মুনাফা লাভের সম্ভাবনা হ্রাস এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'বিনিয়োগের আবহ' পরিস্থিতির অবনতি। ক্রমেই অধিক সংখ্যক টি এন সি অসম্ভবনির্মাণ শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে এদের অনেকগুলি প্রধান ঠিকাদার হয়ে উঠেছে। পেণ্টাগনের অগ্রণী ঠিকাদারদের মধ্যে রয়েছে 'জেনারেল ইলেকট্রিক' ও 'ওয়েস্টিং হাউসের' মতো বিশ্বখ্যাত ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া।

১৯৭০—১৯৮০-র দশকে ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়াদের অসম্ভবপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অনেকগুলি একচেটিয়া যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বিক্রি ও বিদেশে সামরিক-শিল্পের অনুপদূরক সংস্থা ও যৌথ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা থেকে, স্ট্রাটেজিক কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ, ইত্যাদি থেকে অটেল অর্থ উপার্জন করেছে। আন্তর্জাতিক অসম্ভবব্যবসা বৈদেশিক সম্প্রসারণে নমনীয় নীতি পরিচালনা ও একচেটিয়া মুনাফা বৃদ্ধিতে তাদের সামর্থ্য যোগায়। ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া পুঁজি তার সংকীর্ণ স্বার্থপূরণের জন্য অসম্ভবপ্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সামরিক-রাজনৈতিক জোট সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় ও অসম্ভব নতুন ধরন ও প্রণালী উদ্ভাবন অনুমোদন করে প্রধানত তার দালালদের চাপে।

তাই, ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া আসলে সারা

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় আক্রমণাত্মক ও জনবিরোধী কর্মনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ধনকুবেরতন্ত্রের একটি হাতিয়ার। বহু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অনুপ্রবেশকারী ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়া হল গোটা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের আড়তে তহবিল পাচারের একটি পাম্প-বিশেষ। টি এন সি হল লুটেরা, আয়তন ও লালসার মাত্রার দিক থেকে যারা পুঁজিতন্ত্রের গোটা ইতিহাসে অনন্যতার অধিকারী। উন্নয়নশীল দেশগুলি লুণ্ঠন ও উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মেহনতিদের শোষণ তীব্রতর করার সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্বপ্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ও দুনিয়াকে তাপপারমাণবিক যুদ্ধের মূখে ঠেলে দেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

একচেটিয়া ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জোট

সকল পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল থাকে, যে-সমর্থন ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে একদিনও টিকে থাকা অসম্ভব হত। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে রাষ্ট্র হল অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যশীল শ্রেণীর একটি রাজনৈতিক সংগঠন, তা সর্বপ্রকারে বুর্জোয়ার সম্পত্তি রক্ষা ও সেগুণিলর বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বুর্জোয়া কর্তৃক সংখ্যাগুরু মানুষকে শোষণের বিধানিক সুরক্ষার মাধ্যমে বুর্জোয়ার স্বার্থ ও মতামতকে প্রতিফলিত করে। আজ পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়া ও ধনকুবেরতন্ত্রের একটি একনায়কত্ব, পুঁজিপতি শ্রেণীর হস্তগত একটি নমনীয় অস্ত্র, যা সাম্রাজ্যবাদী দেশের শৃঙ্খল রাজনীতিতে নয়,

অর্থনীতির বহু প্রক্রিয়ায়ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনে অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উৎপাদন ও পুঁজির ঘনীভবন, ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়ার উদ্ভব আর শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পরিসর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি কী উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে? এই হস্তক্ষেপের মূল রূপগুলি কী? এই দুটি ব্যাপার এবার ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা যাক।

১। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র: উৎপত্তি ও মর্মবস্তু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এবং বিশেষত খোদ যুদ্ধকালে কয়েকটি মূখ্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের একচেটিয়া ও বর্জোয়া সরকার কর্তৃক কার্যকলাপ সক্রিয় সমন্বয়ের জন্য গৃহীত উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: প্রমাণিত যে তারা নিজ স্বার্থ ও কর্মনীতির সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জটিল ও বহুবিস্তৃত কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছিল। সেই সময় লেনিন লিখেছিলেন: ‘আমেরিকা ও জার্মানি উভয়ই এমনভাবে ‘অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ’ করে যাতে শ্রমিকদের জন্য (অংশত কৃষকদের জন্য) যুদ্ধকালীন সশ্রম কারাবাস এবং ব্যাংকমালিক ও পুঁজিপতিদের জন্য স্বর্গলাভ ঘটে। তাদের নিয়মকানুন শ্রমিকদের অনাহারের পর্যায়ে ‘ঠেলে

দেয়' আর পুঁজিপতিদের নিশ্চয়তা দেয় (গোপনে, প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক ধরনে) বুদ্ধপূর্বকালের চেয়েও উচ্চতর মনোফার।'*

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র অবশ্য সর্বদাই পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ নিরাপদ রেখেছে ও সর্বদাই তার সম্পত্তি রক্ষা করেছে। আর এর অন্যথাও অসম্ভব, কেননা রাষ্ট্র তো অর্থনীতিতে কতৃৎকারী শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের স্বার্থেরই ধারক ও বাহক। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই অবস্থায় থাকে বুদ্ধজোয়া শ্রেণী, তাই সেটা রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতাকেও পরিচালনা করে এবং সে-ই সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

কিন্তু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, যেমন, একচেটিয়া প্রাধান্যের কালপর্বে, বুদ্ধজোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছিল: রাষ্ট্র সর্বকালের তুলনায় সক্রিয়তরভাবে ও বর্ধমান মাত্রায় সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার কার্যকলাপ বাড়িয়েছিল। ফলত জন্মেছিল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ বা 'পরাসাম্রাজ্যবাদ' থেকে পুঁজিতন্ত্রের আলাদা কোন নতুন পর্যায় নয়। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র আসলে

* V. I. Lenin, 'The Impending Catastrophe and How to Combat It', *Collected Works*, Vol. 25, p. 338.

অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদই এবং তার আছে সেই একই বৈশিষ্ট্য, চারিত্র্য ও নিয়ম। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল একটি ব্যবস্থার আওতায় বর্জোয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে একচেটিয়াদের অর্থনৈতিক শক্তির একত্রীভবন, যার উদ্দেশ্য — বৃহৎ বর্জোয়া, ধনকুবেরতন্ত্রের সম্পদবৃদ্ধি, শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় মদ্রুতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রাম এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনার পরিস্থিতি সৃষ্টি।

একচেটিয়া প্রাধান্যের আওতায় উৎপাদনের অব্যাহত ঘনীভবনই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের অর্থনৈতিক ভিত্তি। উৎপাদন ও পুঞ্জির উচ্চ পর্যায়ের ঘনীভবন পুঞ্জিতান্ত্রিক উৎপাদন একচেটিয়াকরণের পর্যায়কে উচ্চতর করে ও ফিনান্স দলগদলির প্রাধান্য বাড়ায়, ফলত একটি হ্রিত প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে ও তাতে সর্বতোভাবে উৎপাদন সামাজিকীকৃত হয়। উৎপাদন অধিকতর সামাজিকীকৃত হলেও পরিভোগ ব্যক্তিগত থেকে যায়, তাতে পুঞ্জিতন্ত্রের যাবতীয় অসঙ্গতি, সর্বোপরি তার মূল অসঙ্গতি — উৎপাদনের সামাজিক চারিত্র্য ও পরিভোগের ব্যক্তিগত-পুঞ্জিবাদী ধরনের মধ্যকার অসঙ্গতি — তীব্রতর হয়ে ওঠে। অসঙ্গতি তিস্ততার এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যখন একচেটিয়াদের মূল অস্তিত্ব ও খোদ পুঞ্জিতন্ত্রই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এটাই আশঙ্ক্য কারণ যেজন্য একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্র রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রে বিকশিত হয়। শেষোক্তের লক্ষ্য হল

শেষাবধি পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার এবং সেজন্যই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শক্তি একচেটিয়াদের শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ও সমাপ্তোষিত হয়।

অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অসঙ্গতির তীব্রতা ও সামাজিক ও শ্রেণীগত সংঘাত বৃদ্ধির সঙ্গে সরাসর যুক্ত। একচেটিয়া কর্তৃক প্রতিযোগিতা ও পণ্যবাজারের ব্যবস্থার অবিরাম ক্ষতিসাধনের দরুন তা স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়: তা সমাজবিকাশের অনেকগুলি চাহিদা মেটাতে বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের তাগিদ মোতাবেক একটি শিল্প থেকে অন্যান্য শিল্পে পুঁজির দ্রুত স্থানান্তর নিশ্চিত করতে পারে না।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'স্বেচ্ছায়' জাতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনে উদ্দীপনা সঞ্চারের কার্যভার গ্রহণ করে, ব্যাপক পরিসরে বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের জন্য তহবিল যোগায়, সংকটবিরোধী নিয়ন্ত্রণ চালু করে, ও অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার কিছু কিছু অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বসায়। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে উদ্দীপনা যোগানোর জন্য তা অসংখ্য বিবিধ ধরন ব্যবহার করে: বহু ধরনের রাজস্ব, আর্থিক ও ঋণদান নীতি এবং (সরকারী মালিকানাধীন সংস্থাগুলির মাধ্যমে) বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতা হিসাবে হাজির হয়। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মূলত বড় বড় কর্পোরেশনের ধনদৌলত বৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান মজবুত করে তাদের সহায়তা যোগায়।

মুখ্য ফিনান্স গোষ্ঠী ও যথেষ্ট ডামাডোল ছাড়াই বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শ্রেণী-সংস্থাগুলিকে সেই কর্মকৌশলে প্রধান ভূমিকাসীন হতে হয়, যার সাহায্যে একচেটিয়া ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা মিলিত হয়ে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনেরই একটি সংস্থা — ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফাকচারার্স। এতে হাজার হাজার কোম্পানি থাকলেও এটির সদরদপ্তরগুলি চালায় কোটি কোটি ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক মাল্টিমেয় একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা এবং ওইসব মালিকরাই সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। তার নেতৃবর্গের গৃহীত সিদ্ধান্তই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারাগুলির নির্ধারক এবং তাদের বস্তুব্যাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন প্রধান পার্টিগুলির (ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান) নেতারা, প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীরা, কংগ্রেসম্যান ও সিনেটররা — যাঁরা বৃহত্তম শিল্পপতি ও ব্যাংকিং একচেটিয়াদের স্বার্থের অনুকূলে একটি কর্মনীতির ধারা চালনায় যথেষ্ট যত্নবান থাকেন।

অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বিদ্যমান অভিন্ন ধরনের সংস্থার মধ্যে উল্লেখ্য: জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে জার্মান শিল্প ফেডারেশন, ব্রিটেনে ব্রিটিশ শিল্পের কনফেডারেশন, ফ্রান্সে ফরাসী উদ্যোগসমূহের জাতীয় কাউন্সিল (পারেনাৎ), ইতালিতে ইতালীয় শিল্পের কনফেডারেশন (কনফিন্দাস্ত্রিয়া), ইত্যাদি। এই

সবগুলিই ওইসব দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একচেটিয়াবর্গ ও রাষ্ট্রের জোটগঠন ও তা সুদৃঢ়করণ বহু বিচিত্র ধরনে এগোয়, তাতে থাকে মিশ্র ব্যক্তিগত-রাষ্ট্রীয় কোম্পানি, ব্যক্তিগত খাত ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যাদের কাজ হল সরকারের জন্য সুপারিশ তৈরি করা; লবিয়িং বা দৃশ্যের অন্তরালে থেকে কাজ করার পদ্ধতি, যাতে চাপ দেয়া হয় রাজনীতিকদের উপর; ব্যক্তিগত তহবিল যোগান হয় রাজনৈতিক দলগুলি ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের; এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও শেষোক্তের ব্যবসায়িক পরামর্শদানের দ্রুত বৃদ্ধি।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া জোটে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পালনীয় ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে: বড় বড় কর্পোরেশনের মালিক ও ম্যানেজাররা প্রায়ই সর্বোচ্চ সরকারী পদগুলিতে লোভনীয় কাজগুলি পায়, আর রাজনীতিক ও উদ্বর্তন সরকারী আমলারা একচেটিয়া স্টকের বড় বড় অংশ দখল করে বা একচেটিয়াদের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত লেনিনের একটি মন্তব্য স্মরণীয়: 'আজকের মন্ত্রী তো আগামীকালের ব্যাংকার; আজকের ব্যাংকার তো আগামীকালের মন্ত্রী। এই ব্যবস্থাই চলে... প্রতিটি দেশে, যেখানে পুঁজির শাসন রয়েছে।'* আমাদের

* V. I. Lenin, 'Banks and Ministers', *Collected Works*, Vol. 24, 1980, p. 122.

কালের পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির কাঠামোর ক্ষেত্রে আজও তা সম্পূর্ণ নিভুল।

কিন্তু এই জোটবন্ধনের মূল ব্যাপার হল একচেটিয়া পুঞ্জির স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সরকারের অর্থনৈতিক কর্মনীতি। এই কর্মনীতির মূখ্য উপাদান: রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়াদের অনুকূলে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টন। এবার এই উপাদানগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

২। বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া মালিকানা হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ পুঞ্জিপতি শ্রেণীর মালিকানা, যা ‘যৌথ পুঞ্জিপতি’ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাগিয়ে ধরা হয়েছে। এঙ্গেলস বলেছিলেন: ‘যে-রূপেই হোক, আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রই মূলগতভাবে একটি পুঞ্জিতান্ত্রিক যন্ত্রবিশেষ, পুঞ্জিপতিদের রাষ্ট্র, মোট জাতীয় পুঞ্জিপতির আদর্শ মূর্তরূপ। এটা উৎপাদনী শক্তি দখলের দিকে যতই এগোয় ততই সে যথার্থ জাতীয় পুঞ্জিপতি হয়ে ওঠে, ততই সে বেশি সংখ্যক নাগরিক শোষণ করে।’*

উৎপাদনের উপায়ে পুঞ্জিতান্ত্রিক মালিকানার রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া রূপ দুটি মূল ধারায় উদ্ভূত হয়েছিল:

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 319.

সরকারী বাজেটের তহবিল থেকে উদ্যোগ নির্মাণের মাধ্যমে ও পুঁজিতান্ত্রিক জাতীয়করণ, অর্থাৎ একক উদ্যোগগুলি এবং শিল্প ও পরিবহনের গোটা শাখার রাষ্ট্রীয় রূপদানের মাধ্যমে এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানির স্টকের একাংশ ক্রয়ের মাধ্যমেও।

কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে 'মিশ্র' ব্যক্তিগত-রাষ্ট্রীয় কোম্পানি গঠিত হয়, যাতে ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলির স্টকের একটা বড় অংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে বা সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির স্টকের বড় বড় অংশ ব্যক্তিগত লগ্নিকারীর দখলে রাখে।

শিল্পোদ্যোগে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় রূপদান — জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে সর্বাধিক ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে: ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও সুইডেনে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফ্রান্স আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণ জাতীয়কৃত উদ্যোগের পরিমাণ শিল্পে প্রত্যাবৃ্ত্তি ও পুঁজিলগ্নির এক-তৃতীয়াংশ, এবং ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণের প্রায় পুরোটা। এই নীতির জোয়ার-ভাটা আছে: যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার জোয়ারগুলির পর সরকারী মালিকানাধীন উদ্যোগকে পুনরায় ব্যক্তিগত মালিকানায় আনার পথ খোলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে কয়লাশিল্প, লৌহ-উৎপাদন, বিদ্যুৎ, বিমান পরিবহন ও অন্যান্য কিছু শিল্পে আংশিক বা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পশ্চিম ইউরোপীয় উৎপাদকরা তৈল-উত্তোলন, তৈলশোধন, অ্যারোস্পেস, মোটর ও ইলেকট্রনিক শিল্প, পরিবহণ এবং আর্থিক ও ঋণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগী হয়ে ওঠার দরুন তাদের সরকারগুলিকে সরকারী মালিকানাধীন বা সরকারী অর্থসংস্থানভিত্তিক কোম্পানি গঠনে রাজি করান হয়েছিল এবং প্রায়ই কোন কোন কোম্পানি এতটা বড় হয়ে উঠেছিল যে সেগুলি জাতীয় ও বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে অগ্রগণ্য হতে পারত। এগুলি ছিল মার্কিন ট্রান্সন্যাশনাল একচেটিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তিশালী। পশ্চিম ইউরোপের এসব কোম্পানির মধ্যে উল্লেখ্য: 'ব্রিটিশ শিপবিল্ডার্স', ফরাসী 'আরোস্পাসিয়েলে' ও পশ্চিম জার্মানির তৈলরাসায়নিক সংস্থা — 'ফেবা'।

রাষ্ট্র সাধারণত সেইসব ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যেগুলি ততটা লাভজনক নয় বা লোকসান দেয়। ব্যাপারটি একচেটিয়াদের জন্য সুবিধাজনক: তাতে কম লাভজনক শিল্প থেকে ব্যক্তিগত পুঁজি প্রত্যাহত হয় ও অধিকতর লাভজনক পথে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, জাতীয়কৃত উদ্যোগসমূহ সর্বদাই শেয়ার-মালিকদের পুনঃক্রয়মূলক পরিশোধের রূপে নিশ্চিত প্রাপ্তি যুগিয়েছে, এমনকি কোন কোন প্রাক্তন মালিককে জাতীয়করণের আগেকার পুঁজির চেয়ে বৃহত্তর পুঁজির উপর দখলদারির সুযোগ দিয়ে থাকে। জাতীয়কৃত উদ্যোগ প্রায়শই লোকসানের অবস্থায় চালু থাকে, কেননা ওগুলি বড় বড় ব্যক্তিগত কর্পোরেশনকে কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য সামগ্রী ছাড় সহ সরবরাহ করে, যাতে

তারা তাদের খরচা কমাতে ও মুনীফা বাড়াতে পারে।

বাস্তব জীবনই এই সাক্ষ্য দেয় যে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত ধনকুবেরদের স্বার্থানুকূল্যেই শিল্পোদ্যোগ জাতীয়করণ করে।

একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্ধমান সরকারী সহযোগিতা সত্ত্বেও বিমাননির্মাণ ব্যবসায় ব্রিটিশ একচেটিয়াদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং মার্কিন, ফরাসী ও পশ্চিম জার্মান কোম্পানিগুলির বর্ধমান চাপের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিমান-রকেট শিল্পের বাজারে তাদের মূল্য অবস্থান টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাদের কোন কোনটি ধ্বংসের মুখোমুখি হলে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় মালিকানায়ে নিয়ে ওগুলিকে বাঁচায় এবং তাতে ছিল সবগুলি অগ্রগামী ব্রিটিশ বিমাননির্মাতা কোম্পানি: 'ব্রিটিশ এয়ারক্রাফ্ট', 'হোকার-সিডলি অ্যাভিয়েশন', 'স্কটিশ অ্যাভিয়েশন' প্রভৃতি এবং এগুলি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'ব্রিটিশ অ্যারোস্পেস' এখন তৈরি করছে বেসামরিক ও সামরিক বিমান ও রকেটের বিপুল অংশ। গঠিত হওয়ার এই স্বল্পকালের মধ্যেই সংস্থাটির পণ্যবিক্রয় ও কৃত্যকের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাইরের বাজারে নিজ অবস্থান যথেষ্ট মজবুত করেছে। এই কোম্পানি এখন পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিমান-রকেট শিল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী একচেটিয়াদের অন্যতম এবং কর্মিসংখ্যা, প্রত্যাবৃতি ও পরিসম্পদের হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে বৃহত্তম।

সংস্থার উপার্জনের অধিকাংশই আসে সরকারী ফরমাশ পূরণ থেকে, যা তাকে একচেটিয়া-উচ্চ মুনাবার নিশ্চয়তা দেয়। যখন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে উঠল যে ‘ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের’ ফরমাসের খাতাটি আগামী বছরগুলির জন্য ভরাট হয়ে গেছে, পাচ্ছে অঢেল মুনাবা তখনই ধনকুবেরগোষ্ঠী জাতীয় মালিকানায় নেওয়া বিমাননির্মাণ ব্যবস্থার মূল অংশটিতে পুনরায় ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। রক্ষণশীল সরকারের সক্রিয় সমর্থনে বিমান-রকেট শিল্পের আংশিক বি-জাতীয়করণ বিষয়ক একটি বিল পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয় এবং ‘ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের’ আন্তর্জাতিক ও আরো কিছু কর্মসূচিতে অব্যাহত তহবিল যোগানোর সরকারী আশ্বাস সহ কোম্পানির একটা বড় অংশ আবার ব্যক্তিগত খাতে চলে যায়।

অ্যারোস্পেস সংস্থাকে জাতীয় মালিকানায় আনার সময় ব্রিটিশ করদাতাদের দেয় অর্থ থেকে ওইসব কোম্পানির মালিকদের বিপুল পরিমাণ খেসারত দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট সরকারী আমলারা বিমাননির্মাণ ব্যবসার ‘স্বাস্থ্য ফেরানোর’ জন্য সেখানে কোটি কোটি পাউন্ড অর্থ চালান দেয়। অতঃপর ‘স্বাস্থ্য’ ফিরলে নবসৃষ্ট এই বিপুল সম্পদ উপহার হিসাবে ধনকুবেরদের ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তারা দেশের গোটা জনগণের অর্থে পুনর্গঠিত শিল্পটির ফায়দা লুটের সুযোগ পায়।

সরকারী সংস্থাগুলিতে অবস্থিত তাদের পেটোয়াদের সাহায্যে ধনকুবেরগোষ্ঠীর কৃত ‘অপারেশন অ্যারোস্পেস’

এই সত্যকে স্পষ্ট হয়ে তোলে — কারা পুঁজিতান্ত্রিক দেশে জাতীয় মালিকানা থেকে লাভবান হয়।

৩। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ

বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রধানত বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির অর্জন বৃদ্ধির এবং তার একচেটিয়া-উচ্চ মূল্যবান লাভের সেরা পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য: প্রথমত, জাতীয় বাজারে একচেটিয়াদের অবস্থান মজবুত করা এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব বিস্তার। এজন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য দাঁড়ায় একচেটিয়াদের স্বার্থের অনুকূল শর্তে পণ্যবিক্রয়ের জন্য একটি নিশ্চিত বাজারের ব্যবস্থা সৃষ্টি, বুনিয়াদী গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল যোগান, একচেটিয়াদের সহজশর্তে ঋণদান, ইত্যাদি। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও পুঁজি রপ্তানিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে। সরকারীভাবে পণ্যক্রয়, ঋণদান ও ফিন্যান্স নীতির মাধ্যমে প্রযুক্তি 'সংকটবিরোধী নিয়ন্ত্রণ' হল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পণ্য ও কৃত্যক সরবরাহের জন্য ব্যক্তিগত কোম্পানিকে ঠিকাদারি দেওয়ার ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সবগুণি সাম্রাজ্যবাদী দেশে যথানিয়মে প্রতি বছরই সরকারী সংগ্রহ বেড়েই

চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রই অ্যারোস্পেস ও রেডিও-ইলেকট্রনিক শিল্পে একচেটিয়াদের উৎপাদিত পণ্যের প্রধান খন্দের এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক ও ধাতু-প্রসেসিং শিল্পে একচেটিয়াদের পণ্যের সেরা খন্দেরদের অন্যতম। সরকারী ঠিকাদারিতে কর্মরত ব্যক্তিগত কোম্পানির মধ্যে বড় বড় কর্পোরেশনগুলি মধ্য অবস্থান দখল করে রয়েছে।

সুবিধাজনক সরকারী ঠিকাদারি ছাড়াও একচেটিয়াদের সহজ শর্তে সরকারী ঋণ দেয়া হয়, বিশেষত নতুন উৎপাদ উদ্ভাবনের জন্য। সরকারী বাজেট থেকে লেসার, সেমিকন্ডাক্টর, অ্যারোস্পেস, পারমাণবিক ও অন্যান্য শিল্পে মৌলিক গবেষণা এবং এমনকি ফলিত গবেষণার অর্থসংস্থানের জন্য মোটা তহবিল খরচ করা হয়। সরকারী সাহায্যের দৌলতে একচেটিয়ারা উৎপাদনের নতুন ধারা উদ্ভাবনের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে পারে এবং তাতে করদাতাদের অর্থে নিষ্পন্ন গবেষণার ফল ওইসব উৎপাদন সংস্থার মালিকদের কুক্ষিগত হয়।

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি হল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, কেননা তাতে সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও গোটা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রভাবিত হয়। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে অনেকগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে মোট বিনিয়োগে সরকারের অংশভাগ ৩৫-৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছত।

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন অবকাঠামো উন্নয়নের উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে: উৎপাদনী অবকাঠামো (যাতে থাকে পরিবহণ, পরিবহণ নির্মাণ, শক্তি-উৎপাদন, যোগাযোগ ও জলসরবরাহ) ও সামাজিক অবকাঠামো (যাতে রয়েছে আবাসন সুবিধা, শিক্ষাসংস্থা, চিকিৎসা বিভাগ, আমোদপ্রমোদ ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থাদি)। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে অবকাঠামো হল সবিশেষ সক্রিয় সরকারী নিয়ন্ত্রণের একটি বিষয়, কেননা এটির অবস্থা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের উপর ও জাতীয় বাজারে একচেটিয়াদের সৃষ্টিত মনুফ্যার পরিমাণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

উৎপাদনী অবকাঠামোর একাংশ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকে, আর বাকিটা টিকিয়ে রাখে সার্বক্ষণিক রাষ্ট্রীয় অনুদান ও সাহায্য। রাষ্ট্র অবকাঠামো উন্নয়নে একচেটিয়াদের হাত থেকে বৃহৎ ও প্রায়শ অনুৎপাদী ব্যয়ভারের দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের হাতে, এবং তার দ্বারা তাদের সক্ষম করে তোলে স্বদেশে ও বিদেশে অর্থনীতির সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্রগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে।

অনেকগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রিটেন) গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কর্মনীতিতে অর্থমুদ্রাগত ও ক্রেডিট ক্ষেত্রের গুরুত্ব প্রচুর বেড়েছে, এবং তার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল মনুফ্যার মদ্রাস্থিতির রোধের সমস্যা সামলানো ও অর্থ প্রচলনকে সাধারণত আরও 'সুস্থ-সবল' করা।

৪। জাতীয় আয় পুনর্বণ্টন

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ পদ্ধতিই বৃহৎ পুঁজির অনুকূলে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টনের ভিত্তিতে তৈরি। এই পুনর্বণ্টনের পশ্চাদবর্তী কর্মকৌশলটি এরূপ: সরকার কর ও রাজস্বের আকারে জনগণের উপার্জনের একটা বড় অংশ রাষ্ট্রীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে ও পরে সেই অর্থ ইচ্ছামতো কাজে লাগায়। এই শতকের গোড়ার দিকে রাষ্ট্র সেখানে তার বাজেটে জাতীয় আয়ের ৫—১০ শতাংশ গ্রহণ করত এখন তা পৌঁছেছে ৩০—৫০ শতাংশে। অতঃপর এই অর্থ ব্যক্তিগত খাত থেকে পণ্য ও কৃত্যক ক্রয় এবং সরকারী ঋণের সুদ পরিশোধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত এই জটিল কর্মকৌশলটি আসলে মেহনতিদের পকেট থেকে একচেটিয়াদের সিন্দুকে অর্থপাচারের একটি চোষকবন্ত্র বিশেষ।

অনেকগদূলি সাম্রাজ্যবাদী দেশে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মনীতি এভাবেই সংগঠিত যে তাতে বৃহত্তম কর্পোরেশনগদূলি যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করে। কোন কোন দেশে পরাবৃত্ত করব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাতে যে-কোম্পানির মুনুফা যত বেশি তার দেয় করার পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে ততই কম হয়ে থাকে। প্রায় সর্বত্রই বড় বড় কর্পোরেশনগদূলিকে সরকারীভাবে কর রেয়াত দেয়া হয় এবং তদুপরি থাকে করযোগ্য আয় কম করে দেখানোর নানা ফন্দিফিকির।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশে একচেটিয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ ও যন্ত্রপাতির কর হ্রাস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কেবল কর হ্রাস কর্পোরেশনগুলিকে প্রতি বছর অন্যান্য খাতে কোটি কোটি ডলার খাটানোর সুযোগ দেয়।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে 'নোংরা ধনীরা' নানা ফান্ডিফিকরের সাহায্যে সরকারী তহবিলে প্রদেয় যে-অর্থ আটকে রাখে তার বার্ষিক পরিমাণ বহু সহস্র কোটি ডলার। তাই সহজবোধ্য যে বাজেটের অর্থের মোটা অংশটিই যোগায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তরাই।

কিন্তু, এই অর্থ কোথায় যায়? অর্থের কিছুটা যায় সামাজিক চাহিদা পূরণে, যার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ক্রমবর্ধমান হারে কুড়াল ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একচেটিয়াদের সিন্দুকে পেঁছায় এবং অঙ্কটি যে ক্রমেই বাড়ছে, তা সরকারী বাজেটের তহবিল একচেটিয়াদের আনুকূল্যে পুনর্বণ্টনের একটি দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে: ১৯৭০-র দশকের শেষে প্রায়-দেউলিয়া হয়ে পড়া বিশাল মোটর কারখানা 'ফ্রাইসলার' অনেক বছর থেকেই বিশ্ববাজারে নতুন মডেলের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল এবং সফলতর 'জেনারেল মোটরস' ও 'ফোর্ড মোটর'-এর মডেলগুলি যথেষ্ট বিলম্বে নকল করছিল।

১৯৭০-র দশকের শেষে জুভালানির আরেক দফা দরবৃদ্ধি ও বিদেশী মোটরগাড়ির বর্ধমান ঢলের

প্রেক্ষিতে 'ক্রাইসলার' তীব্রতর প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। মোটরগাড়ি বিক্রেতাদের চাহিদার দিকে এই কোম্পানি তখন নজর দিত না এবং বর্তমান পরিস্থিতিতেও 'শ্বেতহস্তী' মডেল উৎপাদন অব্যাহত রাখে। সংস্থাটির ঋণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছয়।

সেই কঠিন পরিস্থিতিতে 'ক্রাইসলার' কোম্পানির মালিক ও ম্যানেজাররা হুঁশিয়ারি জানায় এবং স্বল্পকালীন দ্বিধার পর মার্কিন সরকারের সংস্থাগুলি দ্রুত সাহায্য এগিয়ে আসে। 'ক্রাইসলার' সরকারী অর্থ পাবে কি পাবে না তা নিয়ে কোন দ্বিধা ছিল না, দ্বিধা ছিল অর্থের অঙ্ক নিয়ে। প্রথমে এই একচেটিয়ার দাবি ছিল ১.২ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু সরকার নানা ধরনের অনুদানের আকারে দেয় ১.৫ বিলিয়ন ডলার। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত নগদ 'দান' দিয়ে এই একচেটিয়াকে ধ্বংস থেকে বাঁচান হয়।

সরকার জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আকারে সংগৃহীত অর্থ থেকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে বার বার বড় বড় কর্পোরেশনকে দেউলিয়া হওয়ার অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছে এবং তা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, আরও অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশেও।

তাই দেখা যায়, উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য: একচেটিয়া পুঁজির জন্য মুনীফা অর্জনের লক্ষ্যে সেরা পরিস্থিতি সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুস্থিতি বিধান (যতটা সম্ভব কেবল ততটাই)।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের লক্ষ্য মেহনতিদের

স্বার্থবিরোধী, এবং অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশে তা
সবিশেষ লক্ষণীয়, যারা সামাজিক খাতে খরচা কমচ্ছে,
পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সামরিকীকরণ বাড়িয়ে
চলেছে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে বিপদ থেকে উদ্ধার ও তার
অবনতি ঠেকানোই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের
অভীষ্ট। কিন্তু এই কর্তব্য সাধনে সে অসমর্থ, কেননা
বর্তমান কালের পুঁজিতন্ত্রের অর্থনীতির বিষয়গত
বিকাশই অনিবার্যভাবে তার সবগুলি অসঙ্গতিকে
তীব্রতর করে তোলে। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র
উৎপাদনের সামাজিকীকরণকে ঘনীভূত করে, কিন্তু
ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাৎ বদলাতে চায় না, ফলত
পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি — সামাজিক উৎপাদন ও
তার ফলের ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক আত্মসাৎ—তিস্ত্রতর
হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনের
সামাজিকীকরণ পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে অর্জনীয় সর্বোচ্চ
স্তরে পৌঁছয় এবং এভাবে নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের
জন্য পূর্ণাঙ্গ, বৈষয়িক একটি ভিত্তি তৈরি করে:
রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে
যাবতীয় অন্তর্বর্তী পর্যায়ের সম্ভাব্যতা অতঃপর লোপ
পায়। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র আসলে 'গলিত-
পক্ক' পুঁজিতন্ত্র এবং পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন
সম্পর্কগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে
বদলানোর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এখন ক্রমেই
অধিকতর স্পষ্ট ও অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু-ব্যবসায়ী ও সেনানীবর্গ: একটি অশুভ জোট

সামরিক-শিল্প সমাহারের বিকাশ হল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিত্বের সুস্পষ্টতম, সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল ও পরজীবীয় অভিব্যক্তি। এটা এখন সামরিক উন্মত্ততাকে প্রবলতর করে তুলছে।

পশ্চিমের সামরিক শক্তিগর্ভীল এখন বিশ্বের উপর ঘনায়মান পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে কুস্তিরাশ্রু বর্ষণ করে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগর্ভীলর উপর সম্ভাব্য সর্বপন্থায় স্ট্রাটেজিক প্রাধান্য অর্জনের জন্য সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে ইতিপূর্বে আর কখনই এতটা প্রাণপণ উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। নগ্ন সমরবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক যুদ্ধপ্রবণ শক্তিগর্ভীল সারা দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার

ও প্রগতি প্রতিরোধের দাবি জানায় এবং ১৯৭০-র দশকের শেষ থেকে ১৯৮০-র মধ্যদশক পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ বাড়ায়। নিজেদের নীতির ষথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টায় তারা একথা বলে যে ‘সোভিয়েত সামরিক বিপদ’ ও সন্দেহাতীত ‘রুশ সামরিক স্দুবিধা’ মোকাবিলায় জন্যই কেবল তারা তা করছে। বলাবাহুল্য, মিথ্যাটি রটান হচ্ছে পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য। কৌশলটি মোটেই নতুন নয়। সেই ১৯১৯ সালে লেনিন লিখেছিলেন: ‘কিছু আহাম্মক লাল সমরবাদ নিয়ে হেঁচকি করছে। এরা হল রাজনৈতিক জোচ্চোর, যারা ভান করে যে তারা এই অসম্ভবে বিশ্বাসী এবং আপাতমনোহর যুক্তি উদ্ভাবনে ও জনগণের চোখে ধুলো দিতে তাদের উকিলের দক্ষতা ব্যবহারক্রমে সর্বত্র এই ধরনের অভিযোগ ছড়ায়।’* কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই কাউকে ভয় দেখায় নি, কখনই সামরিক প্রাধান্য অর্জনের চেষ্টা করে নি, কখনই অন্যান্য দেশ বা জাতির উপর নিজ ইচ্ছা চাপায় নি: এটাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহীত অবস্থানের নীতি।

এটা অবাস্তব ‘সোভিয়েত বিপদ’ নয়, নিজের অনিবার্য ঐতিহাসিক পতন সম্পর্কে একচেটিয়া পুঞ্জির বর্ধমান ভীতি ও অসুস্থব্যবসা থেকে বিপুল মদুনাফা লাভের তাড়না। তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বাধিক

* V. I. Lenin, ‘The Achievements and Difficulties of the Soviet Government’, *Collected Works*, Vol. 29, p. 66.

প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অস্প্রপ্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগায় ও
আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

১। সামরিক-শিল্প সমাহার

অস্প্রনির্মাণরত একচেটিয়ারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে
বিশেষ সর্বাধিকারক অবস্থানের অধিকারী।
যুদ্ধোত্তরকালে সরকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে তাদের
সংযোগ এতটা বিস্তৃত ও স্ফীত যে তাতে গড়ে উঠেছে
একটি মহা-একচেটিয়া জোট — সামরিক-শিল্প
সমাহার — যাতে অস্প্র-একচেটিয়া ছাড়াও থাকে
সেনানীবর্গ, অর্থাৎ তথাকথিত প্রতিরক্ষা বিভাগের
উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক
শক্তিগুলির প্রতিনিধি — রাষ্ট্রীয় আমলাবর্গ।
সামরিক-শিল্প সমাহার হল এক গ্রিমুখী নরভুক
দানব — নরবলি প্রত্যাশী একটি ভয়ঙ্কর ও অতৃপ্ত
শক্তি। সে-ই উন্মত্ত অস্প্রপ্রতিযোগিতার স্রষ্টা।

সামরিক-শিল্প সমাহার বর্তমান কালের রাষ্ট্রীয়-
একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রের গোটা প্রণালীর একটি মূল
উপাদান হয়ে উঠেছে।

অস্প্রব্যবসায় একচেটিয়া ও রাষ্ট্রের সমাপ্রেষ এবং
রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গ ও
ধনকুবেরতন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অভিমুখী
প্রবণতাসমূহের লক্ষণীয় প্রকট অভিব্যক্তি, যেসব
প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদের যুগের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য।
সামরিক-শিল্প সমাহারের মালিক ও কর্মকর্তারা

সরকারী, প্রশাসনিক ও সামরিক উচ্চপদে আসীন থাকে এবং সেরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃমণ্ডলীতে স্থান পায়। সামরিক সংস্থার নানা পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও উচ্চবর্গের অফিসাররা ধনকুবেরতন্ত্রের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ রাখে এবং সরকারী চাকুরি ছাড়ার পর সামরিক-শিল্প সমাহারের নেতৃমণ্ডলীতে যোগ দেয়। আমরা বার বার দেখেছি যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা বড় স্টকহোল্ডার বা অস্পন্দনির্মাতা কর্পোরেশনের পরিচালক হয়ে থাকে।

অস্পন্দব্যবসার সঙ্গে জড়িত কর্পোরেশনগুলি প্রায়শই সামরিক সংস্থার দায়িত্বশীল পদের জন্য নিজেদের লোক নির্বাচন করে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের পদটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তা ক্রমান্বয়ে পূরণ করেছেন: জেমস ফরেষ্টাল, 'ট্রাইসলার' কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের অন্যতম মালিক; ল. জনসন, পরবর্তীকালে 'জেনারেল ডায়নামিক্স' সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত একটি বিমাননির্মাণ কোম্পানির পরিচালক; রিচার্ড আ. লোভেট, 'নর্থ আমেরিকান অ্যাভিয়েশনের' পরিচালক; চার্লস উইলসন, 'জেনারেল মোটরসের' সভাপতি; নিল এইচ. মেকেলরয়, 'জেনারেল ইলেকট্রিক' কোম্পানির পরিচালক, ইত্যাদি। পেণ্টাগনের প্রধান ক্যাসপার ওয়াইনবার্গার ছিলেন অগ্রগণ্য সামরিক-নির্মাণ 'বেকটেল' কর্পোরেশনের অন্যতম সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। আর রেগন প্রশাসনের এক সময়কার মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব আলেকসান্ডার হেগ

ছিলেন একটি অগ্রগণ্য সামরিক-শিল্প সমাহার 'ইউনাইটেড টেকনোলজিস'-র সভাপতি, পেণ্টাগনের পুরনো চাকুরে ও পশ্চিম ইউরোপে ন্যাটোর সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বহু ব্যবসায়ী, উপদেষ্টা ও সব ধরনের পরামর্শদাতা এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররা প্রতি বছর সরকারী ও সামরিক সংস্থা থেকে সামরিক-শিল্প সমাহারের 'ঘূর্ণ্যমান দরজাগুলিতে' আসে আর উল্টো দিকেও যায়। আপন সাধারণ স্বার্থের খাতিরে এইসব লোক অস্বপ্রতিযোগিতা অটুট রাখতে সর্বদাই নিরলস রয়েছে।

সামরিক-শিল্প সমাহার পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সামরিক প্রস্তুতির দিকে বর্ধমান হারে পরিচালিত করে, তাতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জাতীয় আয়ের সর্ববৃহৎ অংশ যায় সৈন্যবাহিনী পোষণে এবং তাদের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসজ্জা যোগাতে। জাতীয় অর্থনীতির মৌলিক শিল্পগুলি — কৃষি থেকে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পারমাণবিক শিল্প পর্যন্ত — সামরিক প্রস্তুতির মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে এবং তাতে শুদ্ধ দেশিক নয়, বৈদেশিক এলাকাও প্রভাবিত হয় (বিদেশে সামরিক ঘাঁটিগুলি রক্ষা, সহযোগীদের সামরিক 'সাহায্যদান', ইত্যাদি)। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কর্মনীতি সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রভাবে আওতায় রূপলাভ করে এবং 'শত্রুর' হাত থেকে প্রতিরক্ষার 'প্রয়োজন' দেখিয়ে অস্বপ্রতিযোগিতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শীরা প্রাণপণ প্রয়াসে সত্যকে

বিকৃত করেন এবং একথা প্রমাণের প্রয়াস পান যে অস্ত্রের পরিমাণ যত বেশি হয় দিগন্তের বিস্তারও ততই বাড়ে এবং পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ আকাশ থেকে বঞ্চিত করাই পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার প্রশস্ততম পথ।

২। অস্ত্রব্যবসা

বিশ্বে অব্যাহত যুদ্ধাশঙ্কার জন্য কে দায়ী? সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নানা ধরনের রাজনীতিকই এজন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু সকলেই জানে সমাজতান্ত্রিক দেশে কোন ব্যক্তিগত অস্ত্রব্যবসায়ী, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা পুনরুজ্জীবন থেকে, যুদ্ধ থেকে, যুদ্ধপ্রস্তুতি থেকে লাভবান হওয়ার মতো কোন শ্রেণী বা সামাজিক বর্গ নেই। সবগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ শান্তি-উদ্যোগ সর্বদাই এসেছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে নয়। শেৰোক্তদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওইসব শান্তি-উদ্যোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না-করার জন্য সর্বদাই নানা অজুহাত উদ্ভাবন করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক সামরিক মতবাদের বিপরীত সমাজতান্ত্রিক দেশের সামরিক মতবাদ হল সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক। সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, সাম্রাজ্যবাদই উত্তেজনা ও সম্ভাব্য যুদ্ধের আবহ টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী।

খোদ ইতিহাসই এর সাক্ষী। বিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং অসংখ্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংগ্রাম

সংঘাত শূন্য করেছিল। এগুলির কোনটিই কোন ব্যক্তি, রাজনীতিক বা সেনাপতির জন্য ঘটে নি, ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের বর্ধমান আগ্রাসী প্রবণতা থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই কয়েকটি প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সরকার আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মেতে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের জন্য সামরিক-অর্থনৈতিক প্রস্তুতিতে নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম, আধুনিক পারমাণবিক যুদ্ধে 'টিংকে থাকার' জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ তৈরির গবেষণা দ্রুত উন্নত হচ্ছে, স্ট্রাটেজিক কাঁচামাল ও জ্বালানি মজুত হচ্ছে, দ্রুত সামরিক উৎপাদন সংস্থা নির্মাণ করা হচ্ছে, ইত্যাদি।

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র সামরিক-শিল্প একচোঁটয়াদের পণ্য ও কৃত্যক ক্রয় করে, তাদের সামরিক ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থ দিয়ে, সহজশর্তে অনুদান মঞ্জুর করে ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারে উদ্দীপনা যুগিয়ে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করে থাকে।

সরকারী ঠিকাদারি হল অস্ত্রনির্মাতাদের রাষ্ট্রীয় সহায়তা দানের একটি মূল ধরন। সাম্রাজ্যবাদী দেশের বাজেটগুলি ভাল কাটছাঁটের সামরিক উর্দিতেই এখন আইনসভায় আসে। অস্ত্রনির্মাতাদের জন্য সর্বকালের তুলনায় বাজেট উপযোজনে বৃহত্তর অংশভাগ বরাদ্দ করা হয়। সরকারী ঠিকাদারি নিশ্চিত বিক্রয় ও মুনায়ফার সুযোগ দেয়, যার পরিমাণ গড়পড়তা শিল্পের তুলনায় দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পেণ্টাগনের প্রায় দুই-

তৃতীয়াংশ ঠিকাদারি (মূল্যের হিসাবে) পেয়েছে একশ' কর্পোরেশন, অভিজাত সামরিক-শিল্প কর্পোরেশন, আর মোট সামরিক ঠিকাদারির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গেছে দশটি শীর্ষ সংস্থার কাছে। অস্ত্রশিল্পের অগ্রগামী দলটি যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত, কেননা এটির একচেটিয়ারা প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার মূল্যের সরকারী ঠিকাদারি পায়: 'জেনারেল ডায়নামিক্স' কর্পোরেশন ও 'ম্যাকডনেল-ডগলাস' বার্ষিক ৫-৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঠিকাদারি পেয়ে থাকে। নতুন সামরিক কর্মসূচি সৃষ্টি করায় আগেকার তুলনায় বৃহত্তর সরকারী ঠিকাদারি পাওয়ার প্রেক্ষিতে অস্ত্রনির্মাতাদের মূল্যফা অবিরাম বৃদ্ধি পাবে।

১৯৮০-র দশকের গোড়ায় মার্কিন প্রশাসন পারমাণবিক স্ট্রাটégিক অস্ত্রশস্ত্র উন্নয়নের নজিরবিহীন ব্যাপক পরিসরের জটিল এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে, যাতে ছিল: আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইলের একটি নতুন প্রজন্ম উদ্ভাবন ও স্থাপন, ভারী বোমারু বিমান, দূরপাল্লার ক্রুজ মিসাইল। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা বহু বিলিয়ন ডলারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক পুনঃঅস্ত্রসজ্জার কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং 'তারকা যুদ্ধের' সক্রিয় প্রস্তুতি চালায়। ১৯৮৫-১৯৮৯ সালে পেন্টাগনের সামরিক ব্যয় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি এক অগণ্য অঙ্কে পৌঁছেবে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

* *Whence the Threat to Peace*. Military Publishing House, Moscow, 1984, p. 11.

সহযোগী ন্যাটো জোটের পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য
শারিকরাও বৃহৎ অস্ত্রসজ্জার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

পুরো হোক বা না হোক, এইসব নতুন অস্ত্রসজ্জা
কর্মসূচি সামরিক-শিল্প একচেটিয়াদের জন্য সর্বাধিক
লাভজনক ব্যবসা। লেনিন বলেছিলেন: ‘হাজার হাজার
পথে, হাজার হাজার সংবাদপত্রে, হাজার হাজার মণ্ড
থেকে তারা দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, মাতৃভূমি, শান্তি ও
প্রগতি নিয়ে চেঁচায়, গলাবাজি করে — এবং এইসবই
নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, কামান, যুদ্ধজাহাজ,
ইত্যাদিতে কোটি কোটি রুবলের নতুন ব্যয়ের ন্যায্যতা
প্রতিপাদনের জন্য।’*

সামরিক-শিল্প কর্পোরেশনগুলির মুনাম্ফা বাড়ানোর
জন্য সামরিক বিভাগ অস্ত্রচুক্তি পুরস্কার প্রণালী কাজে
লাগায়। কয়েকটি উল্লেখ্য অঙ্ক: পেন্টাগন ‘ম্যাকডনেল-
ডগলাস’কে দেয় বলটুর জন্য ২,০৪৩ ডলার, যেকোন
সাধারণ দোকানে যার দাম ১৩ সেন্ট; ‘হিউজেস
এয়ারক্রাফট’ ৩.৬০ ডলার দামের একটি সুইচের জন্য
আদায় করে ২,৫৪৩ ডলার, অর্থাৎ ৬০০ গুণ বেশি।
মার্কিন বিমান বাহিনীর ঠিকাদাররা সাধারণ ফ্রাস-
লাইটের জন্য পায় ১৮০ ডলার এবং বৈমানিকদের
কেবিনের ৫ ডলার দামের হাতলের জন্য ৬৭০ ডলার;
‘গোল্ড ইনকর্পোরেটেড’ কোম্পানি মার্কিন নৌবাহিনীর
সঙ্গে সম্পাদিত ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার মূল্যের

* V. I. Lenin, ‘Who Stands to Gain?’, *Collected Works*, Vol. 19, p. 53.

একটি চুক্তিতে অতিরিক্ত পেয়েছিল ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ডলার।

কীভাবে তা ঘটল? দেখা গেল প্রতারণার কৌশলটি খুবই সরল: মিথ্যা দাম ধরা বা খরচা বাড়িয়ে দেখান। বহু অসুব্যবসায়ীই এই ধরনের প্রবণতায় অভ্যস্ত, অবশ্য সরকারী কর্মচারীরা তা না-দেখার ভান করে।

অসুব্যবসায়ীরা ক্রেতা শুধু একজনই — সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আর বিক্রেতাও মনুষ্টমেয় — দৈত্যাকার সামরিক-শিল্প সমাহারের একচেটিয়ারা, এবং মূল ঠিকাদারি-গুলি খোলা নিলাম-ডাক ছাড়াই দেয়া হয় যাতে চুক্তির অর্থের অঙ্ক অবিস্থাস্য মাত্রায় বাড়ান যায়।

লেনিনের ভাষায়: ‘পুঁজিপতিরা যখন প্রতিরক্ষার জন্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে, তখন স্পষ্টতই তা আর ‘বিশুদ্ধ’ পুঁজিতন্ত্র থাকে না, জাতীয় অর্থনীতির একটি বিশেষ ধরন হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ পুঁজিতন্ত্র বলতে পণ্যোৎপাদন বোঝায়। আর পণ্যোৎপাদন হল একটি অজ্ঞাত ও অবাধ বাজারের জন্য কাজ। কিন্তু প্রতিরক্ষার জন্য ‘কর্মরত’ পুঁজিপতিরা মোটেই বাজারের জন্য ‘কাজ’ করে না — কাজ করে সরকারী ফরমাশে, প্রায়শই রাষ্ট্রদত্ত ঋণ নিয়ে।’*

বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার সামরিক-শিল্প সমাহারের

* V. I. Lenin, ‘Introduction of Socialism or Exposure of Plunder of the State?’, *Collected Works*, Vol. 25, p. 68.

পশ্চাদভূমিকে নিরাপদ ক'রে বিদেশে তাদের অধিকতর সম্প্রসারণের একটি দৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টি করে এবং সরকারী সংস্থাগুলি তাতে সক্রিয়ভাবে উদ্দীপনা যোগায়। অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে বিদেশে অস্ট্রাবিক্স বৃদ্ধিতে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে সামরিক ও অন্যান্য সংস্থার অন্তর্গত বিশেষ বিভাগ রয়েছে। এগুলির কাজ: অন্যান্য দেশে সামরিক ও পুর্লিশী 'সাহায্য' সম্প্রসারণ, বিদেশী খন্দের খোঁজা, আর্থিক লেনদেন, অস্ত্রপ্তানির অনুমতি ও সামরিক লাইসেন্স সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্রব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত নতুন খসড়া আইন উপস্থাপন।

ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির বর্জ্যেয়া সরকার তাদের অস্ত্রব্যবসায়ী ও অন্যান্য উন্নত পুর্জিতান্ত্রিক দেশের অস্ত্রনির্মাতাদের মধ্যকার যোগাযোগ মজবুতের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। বিভিন্ন দেশের মৃত্যু-ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগাযোগ বিস্তারের জন্য পেণ্টাগনের উদ্যোগে ন্যাটোর কাঠামোর মধ্যে বিশেষ শিল্পগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাই সংস্থাটির কাজ এবং বস্তুত তা ন্যাটোর আন্তর্জাতিক কার্টেল এজেন্সি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। ন্যাটো দেশের সরকারগুলি অস্ত্রনির্মাতাদের মধ্যে যোগাযোগের বহুবিচিত্র ধরন উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিয়েছে, এবং তাতে ছিল অস্ত্রনির্মাণের জন্য পারস্পরিক লাইসেন্স সরবরাহ থেকে আন্তর্জাতিক কনসারটিয়া প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সরকারগুলি একাদিকে যেমন

সামরিক-শিল্প সমাহারের একচেটিয়াদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে তেমনি অন্যদিকে তারা আপন বৈশ্বিক পরিকল্পনা ও মতবাদ রূপায়নে ওগদুলিকে কাজে লাগায়।

৩। সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ

স্ট্রাটোজিক মতবাদ ও পরিকল্পনাগদুলি সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতির একটি মূল উপাদান এবং এই নীতিতে প্রকটিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্রদের বিশ্বাধিপত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুকুমদারি, অন্যান্য দেশের উপর চাপসৃষ্টির জন্য বলপ্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা। এইসব পরিকল্পনার দিকে বারেক তাকালেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতির মর্মবস্তু ও লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পেন্টাগনের সেনানীদের বিশদীকৃত স্ট্রাটোজিক মতবাদগুলির মর্মবস্তু কী? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এগুলি মাঝে মাঝে বদলান হয়েছে, তাতে নানা নামের ছাপ পড়েছে: ‘সমুদ্রচিত প্রতিশোধ’, ‘স্ট্রাটোজিক প্রশমন’, ‘নমনীয় প্রতিক্রিয়া’, ‘সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধ’, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সারমর্ম অপরিবর্তিত রয়েছে, কেননা এই সবগুলিরই লক্ষ্য ছিল ও এখনো আছে — এমন স্তরের সামরিক প্রাধান্য অর্জন, যাতে যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ঝুঁকি ছাড়াই পারমাণবিক অসুপ্রাঘাত হানা যায়, নিজের

সামান্য ক্রটি সহ জাতীয় মদ্রুতি আন্দোলন দমন সম্ভব হয়।

সাম্রাজ্যবাদের সামরিক-স্ট্রাটোজিক মতবাদগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক-শিল্প চক্র ও ধনকুবেরতন্ত্রের সৃষ্ট উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে নিহিত এবং ওগুলিতে তাদেরই স্বার্থ প্রকটিত। সামরিক-শিল্প সমাহারের মধ্যে অস্ত্রব্যবসায়ীরা পারমাণবিক-ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁতকরণে, ওগুলির যুদ্ধক্ষমতা উন্নয়নে নিরলস রয়েছে এবং চিরাচরিত অস্ত্রশস্ত্র, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, মহাশূন্য থেকে গোয়েন্দাগিরির যন্ত্রপাতি ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার নতুন কর্মসূচি তৈরি করেছে। এই সবগুলিরই লক্ষ্য ব্যাপক আগ্রাসন এবং তা ঝড়কি এড়িয়ে মূলত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক-শিল্প সমাহারের সৃষ্ট বিপদ শৃঙ্খল সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্যই নয়, উন্নয়নশীল দেশের জন্যও সেগুলি বর্ধমান সামরিক বিপদ ডেকে আনে। স্মরণ করা যাক সেইসব ঘটনা: যুদ্ধজাহাজ থেকে লেবাননের উপর গোলাবর্ষণ, ভিয়েতনাম ও গ্রেনাডার উপর প্রত্যক্ষ হামলা, ফকল্যান্ডে (মাল্ভিনাস) ঔপনিবেশিক দখল কায়েম রাখার জন্য সামরিক অভিযান।

ন্যাটোর সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সম্প্রতিকালে তাদের প্রভাবের বলয় বৃদ্ধির ধারণাটি প্রচার করেছে ও উন্নয়নশীল দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রকোপ বাড়িয়েছে। পৃথিবীর বহু এলাকা, প্রায়শই যেগুলি

সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, ঘোষিত হয়েছে তাদের 'পরম স্বার্থের' অঞ্চল হিসাবে। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর আয়োজন চলছে সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে খোলাখুলি সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি দেয়। ন্যাটো এখন মার্কিন দ্রুত মোতায়েনক্ষম বাহিনীর ধরনে বিশেষ সামরিক ইউনিট গঠন করেছে।

৪। সামরিকীকরণের ফলাফল

সাম্রাজ্যবাদ সামরিক-শিল্প সমাহারকে লালন করেছে এবং এখন তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির বর্ধমান সামরিকীকরণ সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে দায়বদ্ধ। কিন্তু উপকরণ, অর্থ ও জনসম্পদের অনুৎপাদী ব্যবহার (স্থূলভাবে বললে অপব্যবহার) দ্বারা তা সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনীতিতে একটি অদ্ভুত 'রক্তপথ' সৃষ্টি করে, যদ্বারা অতি-উৎপাদন সংকটের বিপদ ঠেকান যায়। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা থেকে আরও বেশি পরিমাণে এই সাক্ষ্য মিলছে যে এই 'রক্তপথটি' অস্থায়ী ও অনির্ভরযোগ্য। অর্থনীতির সামরিকীকরণ নতুন আরও মারাত্মক বিস্ফোরণ ও উৎক্ষেপের পথ তৈরি করে ও পুঁজিতন্ত্রের মজ্জাগত অসঙ্গতিকে গভীরতর করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদ আপন অভ্যন্তরীণ অসুবিধা উত্তরণের জন্য সর্বদাই সচেতন বিধায় সে বর্ধমান

অস্বেপাদনের আশ্রয় নেয় ও কূটচক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

জনগণের প্রাণশক্তি-শোষক সামরিক-শিল্প সমাহারের একচেটিয়ারা সমাজ থেকে সর্বকালের সর্বাধিক ফায়দা উসূল করে যখন আপন কর্মকাণ্ডের নৈতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিবেচনা ছাড়াই প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ নিজ সিন্দুকে চালান দেয়।

সামরিক-শিল্প একচেটিয়াদের স্ফীতির মর্মার্থ — সামরিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থাৎ পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট পণ্যোৎপাদনের একটা বর্ধমান অংশভাগ উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত পরিভোগের আওতায় না-আসা। সামরিক উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয়ই আসলে অনুৎপাদী। মার্কসের কথায়: ‘শুদ্ধ অর্থনৈতিক পরিভাষায় এটা যেন একটি জাতি তার পুঞ্জির একাংশ জলে ফেলেছে।’* ধ্বংসের উপায়গুলি ব্যবহার আসলে সমাজের উৎপাদনী শক্তির সরাসর ধ্বংসেরই সামিল।

সামরিক প্রস্তুতি প্রতি বছর উৎপাদনশীল পরিভোগ থেকে বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদ ভিন্নপথে পরিচালিত করে এবং তা কার্যকর হয় অর্থনীতির বেসামরিক শাখাগুলির ক্ষতিতে, যাতে প্রায়ই তহবিলের অভাব ঘটে মূলত সামরিক শক্তি নির্মাণে বিপুল পরিমাণ সহায়-সম্পদ লাগানোর জন্য।

* Karl Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie Rohentwurf*, 1857-1858. Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1939, p. 151.

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে অস্ফিনির্মাতা ও সৈন্যবাহিনীর দখলে থাকে অসংখ্য দালানকোঠা, সংস্থা ও বিপুল পরিমাণ জমি। অস্ফিনির্মাণের সামর্থ্য যথানিয়মে পুরোপূরি কাজে লাগান হয় না, কারণ যুদ্ধকালে দ্রুত অস্ফোৎপাদনের লক্ষ্যেই এগুলি গঠিত। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ অর্থনৈতিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ এই যে স্থির পুঁজির একাংশ এতে সংবহনের বাইরে থাকে।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বর্ধমান সামরিকীকরণের ফলে অত্যন্ত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ধরনের কাঁচামাল, শক্তি ও অন্যান্য বৈষয়িক সম্পদ বেসামরিক শিল্প থেকে প্রত্যাহত হয়। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের ১০ শতাংশ পর্যন্ত প্রধান ধরনের কাঁচামাল সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ফোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় টিটেনিয়ামের ৪০ শতাংশ, জার্মানিয়াম ও থোরিয়ামের ৩০ শতাংশ, কোবাল্টের ২০ শতাংশ।

সামরিক-শিল্প সমাহারের উৎপাদ বিস্তারের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে সাধারণ বেকারি বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতির সামরিকীকরণের ফলে বেকারি হ্রাস পাওয়ার উপকথাটি অতঃপর মিথ্যা হয়ে যায়। সামরিক উৎপাদনে বিপুল ব্যয়ের দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারির হার ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে যুদ্ধোত্তরকালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় এবং এখনো তাতে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার্যত দেখা যায় যে বেসামরিক উৎপাদনে ১

বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সৃষ্ট চাকুরির সংখ্যা সামরিক খাতে একই পরিমাণ অর্থলগ্নিতে সৃষ্ট চাকুরির দ্বিগুণ কিংবা তার চেয়ে বেশি। এ হল সামরিক উৎপাদনে গবেষণা ও উন্নয়নের আত্যন্তিক উচ্চব্যয় ও সামরিক উৎপাদনের উচ্চ পদ্ধতিবহুলতার ফল।

সামরিক-শিল্প সমাহারের বিকাশের দরুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন ও বিকৃত উন্নয়নের প্রবণতা দেখা দেয়। বেসামরিক শিল্পের ক্ষতি করে সরকারী অনুদান ও সাহায্যে পুষ্ট সামরিক-শিল্পের একচেটিয়ারা নতুন, আরো নিখুঁত ও বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটাতে থাকে। সামরিক-শিল্প সমাহারের কুবেরদের সাফাইদাররা বোঝাতে চায় যে সামরিক ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নের ফলগুলি বেসামরিক শিল্পেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য। কিন্তু এইসব অগ্রগতি প্রয়োগের সম্ভাবনা ও বেসামরিক ক্ষেত্রে সেগুলির সত্যিকার ব্যবহারের মধ্যে একটি বৃহৎ ও বর্ধমান ফারাক (অস্ত্রশস্ত্র অত্যাধুনিক হয়ে ওঠার দরুন) বিদ্যমান। বরং দেখা যায় প্রায়শই উল্টোটি ঘটে: বেসামরিক শিল্পের উদ্ভাবনগুলিই সামরিক শিল্পে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, সামরিক শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ, সংকরধাতু, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ ও অন্তর্বর্তী উৎপাদ কেবল ওগুলির স্বল্পতা ও মহার্ষতার দরুনই বেসামরিক শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে না।

সামরিক-শিল্প সমাহার সবচেয়ে দক্ষ ও প্রতিভাবান

বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়রদের কাজে লাগায় এবং মোটা অঙ্কের তহবিল ও সহায়-সম্পদ সরিয়ে আনে, ফলত বেসামরিক শিল্পের কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি শ্রুত হয়ে আসে। সামরিক খাতে ব্যয়িত তহবিল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তাতে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সফল ফলত এবং অর্থনীতির বেসামরিক শাখাগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটিত হত।

তাই দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সামরিকীকরণ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি দিকের উপর আত্যন্তিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সেজন্যই দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের অব্যবহী নীতির বিরুদ্ধে এক বর্ধমান লড়াই চলছে, যে-সাম্রাজ্যবাদ অস্বপ্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে ও সজ্ঞানে মানবজাতিকে পারমাণবিক প্রলয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শান্তির সপক্ষে সংগ্রাম যে একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে, প্রধানত তাদের হিংস্রতম বাহিনী সামরিক-শিল্প সমাহারের একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে চালিত সংগ্রাম থেকে অব্যাহত, অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে এই সত্যটি ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি নরনারী পারমাণবিক যুদ্ধাশঙ্কায় আজ সন্ত্রস্ত, কেননা তাতে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে। চরম প্রলয় পৃথিবীতে বিদ্যমান গোটা জীবজগতকে ভস্মীভূত করবে এবং মহাসাগরের বিপুল বিস্তারে বিন্দুবৎ প্রবালবলয়গুলি বা ব্যক্তিগত পরমাণুবোমারোধী আশ্রয়কেন্দ্র — যেখানে হাবাগোবারা প্রলয় এড়ানোর আশায় টিনের খাবার ও জল জমিয়ে রাখছে — কোথাও কোন নিরাপদ স্বর্গের

আশ্বাস থাকবে না। শান্তির জন্য সংগ্রামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে-লক্ষ্যটি সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে তা হল সাম্রাজ্যবাদকে একটি তাপপারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করা থেকে বিরত রাখা।

অস্বপ্রতিযোগিতা সীমিতকরণ ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে বহুবিধ ক্ষেত্রে অসংখ্য শান্তি-উদ্যোগ সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তির সংগ্রামের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস: শান্তির মধ্যে বিকশিত হওয়া ছাড়া মানবজাতির সামনে অন্যতর কোন বিকল্প নেই।

নবম অধ্যায়

নয়া-ঔপনিবেশবাদ

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হল মানবোতিহাসে ঔপনিবেশিক দাসত্বের সর্ববৃহৎ ব্যবস্থা, প্রত্যক্ষ অবদমন ও বহু ধরনের অর্থনৈতিক দাসত্ব সহ হিংস্রতম শোষণের একটি মিশ্রবিশেষ। ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করেছে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব এবং এর পতনে সূচিত হয়েছে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের জীবনে এক গভীর বৈপ্লবিক দিকবদল — এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ফলশ্রুতিতে বিশ্বমানচিত্রে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা এখন শতাধিক।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এই ক্ষতির সঙ্গে আপস করে নি এবং নব্যস্বাধীন দেশগুলিকে আপন

প্রভাব-বলয়ে রাখার জন্য গোপন ও অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলি নির্মমভাবে ব্যবহার করছে।

১। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা: সংকট, ভাঙন ও পতন

এই শতকের গোড়ার দিকে উপনিবেশবাদীদের দখলে ছিল বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা সহ এক বিশাল ভূখণ্ড। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল স্বদেশের আয়তনের ১৪০ গুণ, ডেনমার্কের — প্রায় ৬০ গুণ, ফ্রান্সের — ২০ গুণ বেশি। খুবই স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে উপনিবেশের বর্বর, অমানুষী শোষণের জন্যই পরাধীন জাতিগুলি ও উপনিবেশবাদীদের মধ্যকার বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল যা অনিবার্যভাবেই একদিন-না-একদিন জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে তীব্রতা সঞ্চার করত ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ঘটাত। এই পতন-প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

রাশিয়ায় সংঘটিত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব থেকেই সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকটের সূত্রপাত। এই বিপ্লবই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির সংগ্রামের দীপ্ত শিখাটি প্রজ্বলিত করেছিল এবং পরাধীন জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাশের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট প্রকটিত হয়েছিল বহু উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে

উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রী উচ্ছ্রয়ে। বড় বড় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ভারত, কোরিয়া, তুরস্ক ও চীনে। মরোক্কো, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষণীয় উদ্‌গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট বিপর্যয়ের রূপলাভ করে। জার্মান ফ্যাশিবাদ ও জাপানী সমরবাদের পতনের ফলে জার্মান, ইতালি ও জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির বিলোপ ঘটে। প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি — ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম — যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ার দরুন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সামলাতে ব্যর্থ হয় এবং সেজন্য এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকগুলি দেশের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তাকে বাধ্য হয়েই স্বীকৃতি দেয়।

এককালের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর অনেকগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ারই প্রমাণ। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারত, বর্মী ও ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক প্রণালী থেকে সরে এসেছিল। চীন, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামে জয়ী হয়েছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কালপবেই অধিকাংশ এশীয় দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার

বিরুদ্ধে মূলত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীনতা
ছিনিয়ে এনেছিল।

১৯৫০-র দশকের শেষার্ধ্বে থেকে ক্ষীয়মান
ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন শুরুর হয়: ১৯৪৬ —
১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৬টি, ১৯৫৬ — ১৯৬০ সালের
মধ্যে ২৪টি, ১৯৬১ — ১৯৬৫ সালের মধ্যে ১৬টি
দেশ স্বাধীনতা পায়। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক
ব্যবস্থার পতন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাগুলি
উৎখাতের শেষ পর্যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য
প্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উপর জাতীয়
মুক্তি বিপ্লবের ঢল নামে। পর্তুগালের ঔপনিবেশিক
সাম্রাজ্যটি ধসে যায়, আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের মতো
বড় বড় দেশ স্বাধীন হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে
সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তার চিরায়ত রূপে
আর টিকে থাকে না, কিন্তু প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা-
উপনিবেশগুলি ঔপনিবেশিকতার চরম দূর্ভার
জেরের নিচে চাপিপিষ্ট হতে থাকে। এই জেরগুলি:
অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নস্তর, কোটি কোটি মানুষের
অনাহার, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও পরমায়ুর স্বল্পতা।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
যথানিয়মে একাধারে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী।
সদ্যস্বাধীন দেশগুলি গুরুতর ঔপনিবেশিক জেরের
বিরুদ্ধে, সত্যিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও দ্রুততর
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বকালের সর্বাধিক
সক্রিয় সংগ্রাম চালাচ্ছে। কিন্তু সদ্যস্বাধীন দেশগুলি

যাতে তাদের স্বাধীনতা মজবুত করতে না পারে সেজন্য সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, নানাভাবে ওই দেশগুলিকে নিজেদের সঙ্গে বেঁধে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে যাতে ওদের প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে লুট করা যায়, ষ্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে এইসব দেশের মাটি। ‘বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন’ — এই তাদের অন্যতম চিরাচরিত নীতি।

২। নয়া-উপনিবেশবাদের মর্মবস্তু

সাম্রাজ্যবাদ আজও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে সর্বোপরি তাদের কাঁচামালের গুদাম, পুঁজিলিপ্সির এলাকা, বাজার, সম্ভ্রা শ্রমশক্তি ও অবিশ্বাস্য অতি-মুনাফার উৎস হিসাবে দেখে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনী সম্ভাবনাগুলির যুগযুগান্তের চরম মেরুবর্তিতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পাচ্ছে: এক মেরুতে থাকবে শিল্পোৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি ও অন্য মেরুতে উৎপাদনী শক্তির নিম্নস্তর সহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ। শিল্পোৎপাদনের অত্যাধুনিক ধারার ও উচ্চ-প্রযুক্তির অধিকাংশই প্রাক্তন শাসক দেশগুলিতে কেন্দ্রিত আর বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ‘সীমান্তে’ রয়েছে কৃষির প্রাধান্য, ও ভ্রূণাবস্থায় বিদ্যমান অধিকাংশ জাতীয় শিল্পোৎপাদন। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় আর শেষ পর্যন্ত

সর্বনিম্ন পর্যায়ে ও মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান নিঃস্বদের মতোই থাকে। উৎপাদনী শক্তির এমন মেরুদ্বর্তিতার ফলে আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজনের ক্ষেত্রে এবং উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চরম অসম ও শোষণমূলক চরিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ‘পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের সীমান্তকে’ আপন প্রভাব-বলয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামরিক-রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে, যদিও স্বভাবতই উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপসৃষ্টির পার্শ্বিক রাজনৈতিক, সামরিক ও পুঁজিশী পদ্ধতিগুলি বর্জনের কোন ইচ্ছা তারা পোষণ করে না।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আমল দিতে চায় না, ওইসব দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তারা আপন পথচলার একটি অঙ্গন, একটি সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। তারা তাদের চিরাচরিত কৌশলগুলি কাজে লাগায়, তাতে থাকে নিজেদের ক্রীড়নকদের ক্ষমতায় বসান, অসম চুক্তি আরোপ থেকে সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায়শই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে চরম শাস্তিদানের ভয় দেখায় এবং সম্ভব হলে তারা অবশ্যই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিত। কিন্তু বর্তমানের সম্পূর্ণ পৃথক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তারা জনগণের স্বাধীনতাকে দমনের জন্য

প্রধানত সরাসর সশস্ত্র হামলা চালাতে পারে না। সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপসৃষ্টির জন্য এখন সর্বপ্রথমেই অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলি কাজে লাগাচ্ছে এবং শিল্প ও ব্যাঙ্কিং ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনকে এই চূড়ান্ত ভূমিকার দায়িত্ব দিয়েছে।

আজ সদ্যস্বাধীন দেশগুলির প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত নীতির মর্মবস্তু কী?

এই নীতিরই নাম — নয়া-উপনিবেশবাদ, কেননা এর লক্ষ্য হল সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় রাখা, নতুন পদ্ধতিতে ওই ব্যবস্থার মধ্যে তাদের যথার্থ অসম অবস্থান সুরক্ষিত করা এবং তাদের জনগণকে নতুন ও সুক্ষ্মতর ধরনে শোষণ করা, যাতে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। নয়া-উপনিবেশবাদের মূল অভিষ্ট হল সম্ভাব্য সর্বোপায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্বাধীন অর্থনীতি নির্মাণ থেকে, সত্যিকার স্বাধীন দেশিক ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ থেকে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখিনতা থেকে বিরত রাখা, যাতে তারা কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঙ্গ ও পুঁজিলাগ্নির লাভজনক ক্ষেত্র হয়ে থাকে।

৩। ‘অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ’

নয়া-উপনিবেশবাদের ভিত্তি হল ‘অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ’, যার কোন সীমানা বিশ্বমানচিত্রে নেই।

সাম্প্রতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশকে যথেষ্ট স্বাধীন মনে হতে পারে, অবশ্য এজন্য চাই মানচিত্র বা ভূগোলের পাঠ্যগ্রন্থে আস্তা। কিন্তু আলোচ্য দেশে জায়মান প্রক্রিয়াগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে দেশটি সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যাকার একচেটিয়া ও ব্যাঙ্কগুলির মদুঠোয় রয়েছে এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জালের সদুঠোয় সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বে বাঁধা পড়ে আছে।

অদ্যাবধি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মূল শিল্পগুলির ওপর ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি নিয়ন্ত্রণ আছে এবং এমনকি এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উন্নতদেরও মূল শিল্পগুলি বিদেশী পুঁজির কাছে অত্যধিক মাত্রার নির্ভরতায় বাঁধা : এইসব কর্পোরেশনের হাতে আছে ব্রাজিলের মোটরগাড়ি উৎপাদনের ১০০ শতাংশ, পেরুর টেকনিকাল রবার উৎপাদের প্রায় ৯০ শতাংশ, আর্জেন্টিনার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের (বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া) ৮০ শতাংশের বেশি, মেক্সিকোর রাসায়নিক সামগ্রীর প্রায় ৭০ শতাংশ। কোন কোন খনিশিল্পেও তাদের একচেটিয়া অবস্থান : ৬টি কর্পোরেশন এককভাবে গোটা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে (উন্নয়নশীল দেশে রয়েছে বক্সাইট খনির তিন-চতুর্থাংশ) এবং ৭টি কর্পোরেশনের হাতে রয়েছে উৎপন্ন তামার এক-চতুর্থাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনের একচেটিয়া অবস্থান নানা রূপ পরিগ্রহ করে : সরাসর দখল, সাময়িক অবমূল্য প্রবর্তন (অর্থাৎ

স্বাভাবিকের চেয়ে কম দাম), বৈষম্যমূলক দর প্রয়োগ, নতুন প্রযুক্তি প্রদানে অস্বীকৃতি, ইত্যাদির সাহায্যে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণ বা অধীনস্থ করা। স্থানীয় বাজারের উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বাজার থেকে স্থানীয় জাতীয় সংস্থাগুলিকে হঠানোর লক্ষ্যে তারা যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পথে প্রায়শই পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কটেল-চুক্তি সম্পাদন করে।

উন্নয়নশীল দেশে টি এন সি-র লগ্নিকৃত পুঁজি প্রায়শই তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে উঠে আসে এবং তা মূলত স্বল্প জাতীয় বেতন, সস্তা জমি, কাঁচামালের সমৃদ্ধ উৎস ও অন্যান্য হেতুর জন্যই। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী একচেটিয়াদের মুনাজার হার উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী একচেটিয়াদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাঁচামালের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। খনির টি এন সি-রা প্রায়ই উৎসস্থলে খনিজ কাঁচামালের প্রাথমিক প্রসেসিংই শূদ্ধ সম্পূর্ণ করে এবং অবশিষ্ট প্রসেসিং ও তৈরী মাল উৎপাদন নিষ্পন্ন হয় মূলত তাদের স্বদেশে। খনিজ কাঁচামালকে 'ব্যবহারোপযোগী করে তোলার' সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি একচেটিয়া দরগঠনের বন্টনমূলক পথ পরিচালনা করে এবং কয়েকগুণ দরবৃদ্ধি সহ পুনরাবিভূত হয়। কাঁচামাল থেকে অর্জনের মোটা অংশ টি এন সি-র সিন্দুকেই জমে,

তাতে থাকে মূল কাঁচামালের রপ্তানি দর এবং অন্তর্বর্তী বা তৈরী উৎপাদের শেষ বিক্রয় দরের মধ্যকার বিয়োগফল। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাঁচামাল ব্যবহারকারীরা প্রতি বছর দেয় ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, কিন্তু খোদ উন্নয়নশীল দেশগুলি পায় ওই অঙ্কের মাত্র ১৫ শতাংশ, অবশিষ্ট যায় টি এন সি-র তহবিলে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে বিদেশী একচেটিয়ারা সেইসব ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উন্নয়নে আগ্রহ দেখায় যা সাম্রাজ্যবাদী দেশের বাজারের সঙ্গে ওদের কঠিনতর বাঁধনে বাঁধে। উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পোৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ এখন টি এন সি-র হাতে। উন্নয়নশীল দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে সরাসর মোট বিদেশী পুঁজিলগ্নিতে টি এন সি-র অগ্রগামী দঙ্গল, মার্কিন একচেটিয়াদের অংশভাগ এখন অর্ধেকের চেয়ে বেশি।

টি এন সি ব্যাপকভাবে ‘প্রযুক্তিগত ঔপনিবেশবাদ’ কাজে লাগায়, তাতে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উচ্চ-প্রযুক্তি সংগ্রহে বাধাদান, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নির্ভরতা অব্যাহত রাখা। প্রযুক্তি স্থানান্তর একটি বৈষম্যমূলক বিষয়, তাতে রয়েছে বহুবিধ বাধানিষেধ ও প্রায়শই সেগুলি অতি মহার্ঘ। নতুন প্রযুক্তি প্রথমে যায় উন্নয়নশীল দেশে টি এন সি-র শাখাগুলিতে অতঃপর বহুবিধলম্বে জাতীয় কোম্পানিগুলিতে পৌঁছয়।

তদুপরি, স্থানীয় কোম্পানিগুলির কাছে এগুলির বিক্রয় নানাবিধ আপত্তি ও শর্ত কণ্টকিত থাকে। এভাবে একটি টি এন সি কোন জাতীয় কোম্পানিকে সেই দেশে তার শাখা থেকে অর্ধ-তৈরি উৎপাদ ও সাজসরঞ্জাম দ্রুত কিংবা অতিরিক্ত অর্থে অপ্রয়োজনীয় কোন প্রযুক্তি গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। বিদেশী কর্পোরেশনগুলি প্রায়শই স্থানীয় লাইসেন্স দ্রুততাদের শেয়ারের একাংশ দাবি করে, তৈরী সামগ্রী রপ্তানি নিষিদ্ধ করে, অন্যান্যভাবে তাদের কার্যকলাপের স্বাধীনতা সীমিত করে।

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশে বর্ধমান প্রতিরোধের মূখ্যমুখি হওয়ার ফলে টি এন সি 'অভিযোজনার রণনীতি' নামের নমনীয়তর একটি কর্মনীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, স্থানীয় ব্যক্তিগত ও (কিংবা) সরকারী পুঁজির (ভারত, মধ্য প্রাচ্যের অনেকগুলি দেশ ও অন্যত্র) শরিকানা সহ 'মিশ্র কোম্পানি' গঠন করেছে। এইসব 'মিশ্র কোম্পানি' ও 'শরিকানার' দৌলতে উন্নয়নশীল দেশে টি এন সি-র পুঁজি সম্ভাব্য জাতীয়করণের আশঙ্কা থেকে, বাড়তি কর ও তাদের ক্ষুধারোধের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আরোপের বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। জাতীয় কোম্পানির সাইনবোর্ডের আড়ালে টি এন সি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির মূল অবস্থান-গুলিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তাদের প্রাকৃতিক ও জনশক্তি সম্পদের উপর অবাধ লুণ্ঠন চালায়।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি উন্নয়নশীল দেশকে প্রদত্ত 'সাহায্য' সম্পর্কে অনেক কথা বলে, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত এইসব 'অনুদান' ও 'নিঃস্বার্থ সাহায্য' ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গোটা ব্যাপারটি মোটেই তা নয়, কেননা এই তহবিলগুলি প্রায়শই খোদ দাতাদের অত্যাচ্ছ সুদের হারের রূপে তাদের মোটা অঙ্কের অর্থ যোগায়। অধিকন্তু, যখন উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ 'সাহায্য' দেয় তখনই তারা তাদের একচেটিয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু সুযোগ ও সুবিধার দাবি জানায় ও সেগুলি আদায় করে নেয়।

'সাহায্যের হাত বাড়িয়ে' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এককভাবে ও যৌথভাবে কাজ করে। তাদের প্রধান হাতিয়ার হল আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ও ফিনান্স সংস্থাগুলি: 'ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (আই বি আর ডি), বিশ্ব ব্যাংক নামেও পরিচিত, 'ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন' (আই এফ সি) — বিশ্ব ব্যাংকের 'সুদলভ-ঋণ বাহু'; ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আই এম এফ); বিশ্ব ব্যাংকের আরেকটি বাহু 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসসিয়েশন' (আই ডি এই) এবং দূরস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বিবিধ আঞ্চলিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও তহবিল।

এইসব পুঁজিবাদী ঋণদান সংস্থার বিশেষজ্ঞদের পর্যটকের মতো দেখালেও একটি উন্নয়নশীল দেশ

সফরের পর সেটির দর বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংক বিশেষজ্ঞরা ওই দেশের অর্থনীতির 'স্বাস্থ্য' উন্নয়নের জন্য তাদের ব্যবস্থাপত্র চাপিয়ে দিয়েছেন। এইসব ব্যবস্থাপত্রের দৌলতে সাধারণত টি এন সি হাতসাফাইয়ের সম্ভাব্য অবাধ অধিকার পায়, তুলে দিতে হয় দরনিয়ন্ত্রণ ও আমদানির বাধানিষেধ, অতি-মুনাফা পাচারে বিদেশী কোম্পানিগুলির অবাধ অধিকার বর্তায়, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় খাত সীমিতকরণ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সম্ভাব্য সকল উৎসাহদানই এই দমনমূলক 'চিকিৎসার' মূল রাজনৈতিক দিক।

বিশ্ব ব্যাংকের নতুন ঋণ এইসব ব্যবস্থাপত্র পূরণকে শর্তাধীন করে এবং তহবিল বরাদ্দের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে যারা এই ব্যাংককে নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতির একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগায়: আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক সাইনবোর্ডের আড়ালে সদ্যস্বাধীন দেশগুলির উপর চাপসৃষ্টির জন্য তাদের ক্ষমতা ও অর্থ ব্যবহার করতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 'সাহায্য' হরেক রকমের ব্যক্তিগত পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে জড়িত থাকে এবং কে যথার্থ পুঁজি-রপ্তানিকারী — বর্জ্যেয়া রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত উদ্যোগী — সরকারী ও আন্তঃসরকারী ফিনান্স ও ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ধমান গোলকধাঁধায় তাদের অনুসৃত কার্যকলাপের অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতির মধ্যে তা নির্ধারণ বস্তুত দরুহ

হয়ে ওঠে। এইসব আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ও ফিনান্স প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই ব্যক্তিগত ঋণের পুঁজি রপ্তানিতে মধ্যগ হিসাবে কাজ করে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'সাহায্য' দিয়ে সেখানে টি এন সি-র কার্যকলাপের ঝুঁকি সর্বনিম্ন মাত্রায় কমানোর চেষ্টা করে তেমনি একচেটিয়ারাও সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্যের' কোন কোন কার্যসম্পাদনে মোটেই পিছ-পা হয় না। এটা 'ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন অব বেইস ইকনমিক্‌স্', 'খয়রাতি' প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপেই সর্বাধিক প্রকটিত : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম ধনকুবের রকফেলার পরিবারের হাতে প্রতিষ্ঠানটির ৭০ শতাংশ পুঁজি রয়েছে। এইসব 'খয়রাতি' প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কর্মনীতি পরিচালনা করে, তাতে স্থানীয় রক্ষণশীল স্তরগুলি ও উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যকার বন্ধন সম্প্রসারণ ও পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুপ্রবেশ ঘটান সহজতর হয়।

ব্যক্তিগণ ঋণদান এখন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-বলয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক-একচেটিয়াদের টাকার ঝুলি আজ নয়া-উপনিবেশবাদের অন্যতম সর্বাধিক ফলপ্রসূ হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদ একবার শিকারের গলায় তার দীর্ঘ ফাঁস আঁটতে পারলে তাকে কেবল অর্থনৈতিকভাবেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও যদৃচ্ছা হেঁচড়াতে পারে। বস্তুত, শিকার একদিন

আবিষ্কার করে যে ওই আর্থিক বন্ধন আসলে তার হাত-পা বেঁধে ফেলার, আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পরাধীনতারই সামিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে উন্নয়নশীল দেশ-গুলির ঋণ অবিশ্বাস্য দ্রুতহারে বাড়ছে: ১৯৭০-র দশকের গোড়ার দিকে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮০-এর দশকের মধ্যকালে ১ ট্রিলিয়নে পৌঁছেছে ও এখনো বাড়ছে। এই কল্পনাতীত অঙ্ক মনকেই কেবল সচকিতই করে না, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ আর্থিক ঋণের কতটা গভীরে নিমগ্ন তাও দেখায়।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি যখন ১৯৭০-র দশকে ঋণ নিয়েছিল তখন স্বপ্নেও ভাবে নি যে তারা ১৯৮০-র দশকে এমন মারাত্মক দুর্দশায় পড়বে। কিন্তু কী ঘটেছিল?

একটি কারণ — বিশ্বের অর্থবাজারে ঋণের স্রুদের হাব হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাতারাতি কোটি কোটি ডলারে আরও ধনী হয়ে ওঠা মহাজনরা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের চুক্তিমান্যতা সম্পর্কে চাপ দিচ্ছিল। অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশ ধ্বংসের মূখোমুখি দাঁড়ায়: গোটা রপ্তানির উপার্জনই চলে যায় ঋণ পোষণে, অর্থাৎ আসল ও সুদ পরিশোধে। তাতে তারা নতুন ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয় এবং পশ্চিমা ব্যাংক-মালিকরা তৎক্ষণাৎ ওদের প্রয়োজনের সুযোগ গ্রহণ করে: ঋণশর্ত কঠিনতর করা হয় এবং তাতে এমনসব দাবি থাকে যে অধমর্ণ দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমত্বের উপর মারাত্মক আঘাত আসে।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যকার বাণিজ্যেও নয়া-উপনিবেশবাদের ছাপ পড়ে, কেননা পশ্চিমী একচেটিয়ারা উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের সমৃদ্ধতর করার জন্য এগুলি ব্যবহার করে থাকে: ১৯৭৫ সালে একটি লরির দাম ছিল ৫.৩ টন তুলোর সমতুল্য আর আজ সেই দাম ১২ টন তুলোর চেয়েও বেশি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজেদের জন্য অবিরাম সুবিধালাভের দাবি জানায় আর উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় কোম্পানিগুলির তৈরি শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানির পথে বাড়তি বাধা সৃষ্টি করে।

৫। নয়া-উপনিবেশবাদ ও অস্বপ্রতিযোগিতা

সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আরও গভীরভাবে অস্বপ্রতিযোগিতায় জড়ানোর চেষ্টা করছে এবং তা নয়া-উপনিবেশবাদেরই আরেকটি রূপ। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি বিশ্বের মোট অস্ব রপ্তানির তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই যাচ্ছিল। অবশ্য তাদের কয়েকটি স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা তাদের ক্রীড়নকদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়াতে (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে) বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমা অস্বের অধিকাংশই যায় সাম্রাজ্যবাদের ‘আঞ্চলিক পাহারাদারের’ ভূমিকাসীন দেশগুলিতে এবং সেইসব অস্বশস্র ব্যবহৃত হয়

উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক শক্তিগর্ভিত
দমনে, স্থানীয় সংঘাত বাধানোর কুর্মে।

সাম্রাজ্যবাদী সরকার কর্তৃক অস্ত্র রপ্তানির সিদ্ধান্তের
লক্ষ্য — আমদানিকারী দেশের, বিশেষত যেসব দেশ
স্ট্রাটাজিক সম্পদে সমৃদ্ধ সেগর্ভিত রাজনৈতিক
অভিভূখিনতার উপর প্রত্যক্ষ চাপ-প্রয়োগ। অধিকন্তু,
সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, আক্রমণাত্মক
সামরিক-রাজনৈতিক জোট দাঁড় করান, 'কূটনৈতিক
উদ্যোগে' সমর্থন যোগান, ইত্যাদির প্রয়াস পায়।

উন্নয়নশীল দেশগর্ভিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্ধমান
সামরিক অনুপ্রবেশ তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও
রাজনৈতিক বিকাশের উপর পর্যাপ্ত নেতিবাচক প্রভাব
ফেলে।

বর্ধমান হারে পশ্চিমা অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ফলে
সাম্রাজ্যবাদের উপর অনেকগর্ভিত উন্নয়নশীল দেশের
নির্ভরতা বাড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সামরিক-
শিল্প সমাহারের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে। এরই
ফলশ্রুতি — স্বৈরাচারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং
গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও জনগণের দরিদ্রতম স্তরের জন্য
সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন বাতিল।

উন্নয়নশীল দেশে পশ্চিমা অস্ত্র রপ্তানির অর্থ —
সামরিক-শিল্প সমাহারের একচেটিয়াদের অনুকূলে
তাদের জাতীয় আয়ের একাংশ পুনর্বণ্টন, নিজের
উন্নয়নের পক্ষে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী আমদানির
সামর্থ্য হ্রাস, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি
এবং শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের গতি বাড়ানোর জন্য

অপরিহার্য তাদের সীমিত সম্পদটুকু ক্ষয়। বর্তমানে সামরিক খাতে ব্যয়িত তহবিল অর্থনীতির বেসামরিক খাতে ব্যয়িত হলে সদ্যস্বাধীন দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অনেকগুলি সমস্যার দ্রুততর ও সফলতর সমাধান সম্ভব হত।

নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্ণোদ্যমে গ্রীড়নক ও একনাশকত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘৃস দেয় এবং ষড়যন্ত্র, কুদেতা, প্রগতিশীল নেতৃবর্গের হত্যা, প্রবণতা ও র‍্যাকমেইলের আশ্রয় নেয়, জাতীয় ও উপজাতীয় বিবাদে ইন্ধন যোগায়। যখনই দূর্নীতিবাজ সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে তখনই সাম্রাজ্যবাদীরা ‘স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র’ রক্ষার অজুহাতে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব দমনের প্রয়াস পায়, এমনকি প্রায়শই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আশ্রয়ও নেয়, যেমনটি ঘটেছে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর ষড়্যে, গ্রেনাডার উপর নিলর্জজ হামলায় এবং আঙ্গোলা, নিকারাগুয়া ও অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপে।

উন্নয়নশীল জাতিসমূহ নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এবং সত্যিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছে।

৬। কোন পথ বেছে নেব?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তিলাভের কর্তব্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এর অর্থ কী?

এর অর্থ: জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা, কৃষির বিকাশ, উপনিবেশবাদীদের আরোপিত কৃষির একপেশে বিশেষীকরণ লোপ, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

এইসব জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সবই তাদের রয়েছে: উন্নয়নশীল দেশগুলি খনিজ, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, তাদের আছে বিপুল পরিমাণ উর্বরা জমি, বছরে শস্য, ফল-ফলাদি ও শাকসবজির ২ — ৩ ফসল তোলার মতো অনুকূল আবহাওয়া, কেউ কেউ আবার অত্যুচ্চ বৈষয়িক সংস্কৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ।

কীভাবে এই শর্তাবলী ব্যবহার করা যায়? কীভাবে জরুরি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির দ্রুততর সমাধান সম্ভব?

রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রাক্তন উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনগণ দুটি বিকল্প পথের সামনে এসে দাঁড়ায়: পুঁজিতান্ত্রিক ও অ-পুঁজিতান্ত্রিক। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেকটি দেশের জনগণের উপরই বর্তায়।

পুঞ্জিতান্ত্রিক পথযাত্রী দেশগুলির পক্ষে আপন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর নির্ভরতা উত্তরণ খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। হরেক রকমের সংকটের ঘটনা ও পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতির তীব্রতা বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কেননা তাদের আয়ের একটা বড় অংশ পাচার হয়ে যায় এবং জাতীয় অর্থনীতির সুবিধার্থে দেশের সম্পদের একটা বড় অংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খর্বিত হয়।

অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশ অ-পুঞ্জিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে। এইসব দেশের মোট জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৫ কোটি, তাদের বসবাসের মোট এলাকার আয়তন ১.২ কোটি বর্গ কিলোমিটার।

কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও অ-পুঞ্জিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথবর্তী দেশগুলি অভিন্ন প্রধান পথেই আপন উদ্যোগ পরিচালনা করে: ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া, স্থানীয় বড় বড় বার্জেয়া ও সামন্তপ্রভুদের অবস্থান বিলোপ; অর্থনীতিতে গণরাষ্ট্রের নেতৃত্বমূলক উচ্চাবস্থান দখল ও উৎপাদনী শক্তিগুলির পরিকল্পিত বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা; গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহদান; সমাজ-জীবনে মেহনতিদের ভূমিকা সম্প্রসারণ এবং জনদরদী জাতীয় কর্মী সহযোগে প্রশাসনযন্ত্রের ক্রমাগত মজবুতি বিধান; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের

ব্যাপক অভিজ্ঞতা ব্যবহার, সদ্যস্বাধীন দেশগুলি ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতার সম্প্রসারণ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহুদুখী ও নিঃস্বার্থ সাহায্য আজ অ-পুঞ্জিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথবর্তী দেশগুলির উপর বিপুল বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলছে। উন্নয়নশীল ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যকার সহযোগিতার ভিত্তিটি সমতা, পারস্পরিক সুবিধা ও একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অহস্তক্ষেপের নীতিতে নিহিত এবং তা শান্তি ও প্রগতির আদর্শের সহায়ক।

দশম অধ্যায়

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট

পুঁজিতন্ত্রকে সঙ্গত কারণেই বলা যায় — ‘অসুস্থ সমাজ’, ‘ভাসন্ত দিশাহারা সমাজ’, ‘ভবিষ্যৎহীন সমাজ’। পুঁজিতন্ত্র এখন এক নজিরহীন গভীর সংকট যন্ত্রণায় নিপতিত এবং তা রোমান সাম্রাজ্যের সংকটের সঙ্গে তুলনীয়, যে-সংকট পুরাকালীন দার্শনিকের সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনকে চিহ্নিত করেছিল। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি দিক সংকটবিজড়িত: অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আইনকানুন। এজন্যই তা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট হিসাবে জ্ঞাত। লেনিনের ভাষায়, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট

হল একটি ঐতিহাসিক যুগ, 'গোটা পুঁজিতন্ত্রের পতনের ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের যুগ'।*

১। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট: উদ্ভব ও মধ্য পর্যায়সমূহ

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের মূলে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব (১৯১৭), যখন লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য মেহনতিদের সঙ্গে একযোগে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠমাংশ ভূমি থেকে পুঁজিপতিদের শক্তি উৎখাত করেছিল, প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিজেদের শাসন, ব্রতী হয়েছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণে। এই ঘটনায় সূচিত হয়েছিল একটি নতুন যুগ, দুটি বিরোধী সমাজব্যবস্থায় বিশ্ববিভাজন ও দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের যুগ, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের যুগ, বর্ধমান সংখ্যক জাতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথবর্তী হওয়ার যুগ।

বিশ্বপরিসরে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই

* V. I. Lenin, 'Extraordinary Seventh Congress of the R.C.P.(B), March 6-8, 1918. Report on the Review of the Programme and on Changing the Name of the Party, March 8', *Collected Works*, Vol. 27, 1977, p. 130.

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের মূল আধেয়। প্রতি দশকেই পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বব্যাপ্ত পশ্চাদ্ভূমি সংকুচিত হয়ে আসছে: রাশিয়ার পর আরও কয়েকটি দেশ পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে — এটি হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের একটি গোষ্ঠী, যারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সাধারণ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার যে-সংকট পরবর্তীকালে এর অবক্ষয় ও পতন ঘটিয়েছিল, তা হল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্র্য। উন্নয়নশীল দেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিল এবং এখন পূর্ণ মনুষ্টি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণের প্রত্যাশায় অ-পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ গ্রহণ করেছে।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের প্রধান উৎস: সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির তীব্রতা, অর্থনীতির বর্ধমান অস্থিরতা, বন্ধাবস্থা ও পরজীবিতা বৃদ্ধি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার অসঙ্গতি বহুকাল থেকেই বাড়ছে ও গভীরতর হচ্ছে, সামরিকীকরণ তীব্রতর হচ্ছে, অসম্প্রতিযোগিতা এগিয়ে চলছে, অর্থনৈতিক সংযোগের গোটা ব্যবস্থাই খুলে যাচ্ছে। বাজার ও কাঁচামালের জন্য সংগ্রামের মধ্যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী অসঙ্গতি তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মদ্রা, শক্তি, কাঁচামাল, খাদ্য ও

বাস্তুসংস্থানের সমস্যা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে বেড়েই চলেছে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি বিস্তৃত হচ্ছে রাজনৈতিক ও আত্মিক সংকট। মেহনতিদের বর্ধমান একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামের জবাবে সাম্রাজ্যবাদ এখন সক্রিয়তরভাবে ও প্রায়শই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছে।

২। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের পর্যায়সমূহ

বিকাশের পথে পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট তার নির্দিষ্ট পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে। প্রথম পর্যায় (১৯১৪-১৯১৮ থেকে ১৯৩৯-১৯৪৫) সর্বোপরি চিহ্নিত হয়েছিল রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ে, যখন বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দু'টি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। অক্টোবর বিপ্লবেই প্রথম সূচিত হয়েছিল শোষণ থেকে মানদুশের মুক্তি, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ধারণাবলীতে প্রাণসঞ্চার — এইসবই বিশ্ব-ইতিহাসের পরবর্তী গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এটা ছিল সারা দুনিয়ার বৈপ্লবিক পুনর্নবায়নের এক যুগের বার্তাবহ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশের যুগযুগান্তরের অনগ্রসরতা দূর করে এবং ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম কালপর্বে একটি প্রবল শিল্পশক্তি হয়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুণি দেখিয়েছিল।

সেই ১৯৩০-র দশকের শেষে মোট উৎপাদের হিসাবে

সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বে দ্বিতীয় ও ইউরোপে প্রথম স্থানে উন্নীত করতে এদেশের মানুষকে কী কী বাধা অতিক্রম ও বীরোচিত সাফল্য অর্জন করতে হয়েছে তা অকল্পনীয় বৈকি। বিশ্বের উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশভাগ ১৯১৩ সালের ৪ শতাংশ থেকে ১৯৪০ সালে প্রায় ১০ শতাংশে পৌঁছেছিল।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের প্রথম পর্যায়ে আসে উপনিবেশগর্ভীতে অভ্যুত্থান ও জাতীয় মন্বন্তরসহ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট।

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের এলাকা সংকুচিত হলে ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট দেখাদিলে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অসঙ্গতিগুলি তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনবার পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত হয়েছিল এবং এগুলির মধ্যে ১৯২০-র দশকের শেষের ও ১৯৩০-র দশকের গোড়ার দিকে সংকট ছিল খুবই গভীর। ১৯৩৭ সালে, আগেকার মন্দার রেশ মিলিয়ে না যেতেই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি আরেকটি অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তার অকাল সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শুরু করেছিল হিংস্রতম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং তা শেষ হয়েছিল ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারী ও জাপানী সমরবাদীদের পূর্ণ উৎখাতে। এই বিজয়ে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ফলশ্রুতিতে বিশ্বশক্তিস্থিতির আরও পরিবর্তন ঘটেছিল সমাজতন্ত্রের অন্তর্কূলে এবং শত্রু হয়েছিল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়।

পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভ এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন ছিল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৫০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত) মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া) আওতায় ছিল পৃথিবীর ভূভাগের ১৭ শতাংশ ও জনসংখ্যার ৯ শতাংশ, কিন্তু ১৯৫০-র দশকের শেষ নাগাদ এগুলি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২৬ ও ৩৫ শতাংশে পৌঁছয়।

সমাজতন্ত্রের প্রদত্ত সুবিধার দৌলতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলি তাদের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল: ১৯৬০-র দশক নাগাদ তাদের শিল্পোৎপাদন ছিল ১৯৩৭ সালের ৬.৮ গুণ; ওই সময়কার পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ২.৫ গুণেরও কম বৃদ্ধি প্রসঙ্গত তুলনীয়।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন শত্রু হয়, নির্যাতিত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়, গোটা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে জড়িয়ে সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ দুর্বলতাসাধন, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিশালী আন্দোলন জোরদার হয়ে

ওঠার প্রেক্ষিতে জাতীয় মদ্র্জি বিপ্লবের আঘাতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৪৫ সালে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল ৭০ কোটির বেশি আর ভূখণ্ডের আয়তন ৩.৭ কোটি বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু ১৯৫০-র দশকের শেষে ওগুলির জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ কোটিরও কম আর ভূখণ্ডের আয়তন ২ কোটি বর্গ কিলোমিটারের সামান্য বেশি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পরিসর দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল।

একইসঙ্গে পদ্র্জিতান্ত্রিক দ্দনিয়ায় অস্থিরতা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদ তখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর ও সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্র ধ্বংসের পাঁয়তারা কষছিল। সামরিকীকরণ তখন উৎপাদনে উদ্দীপনা সঞ্চার ও পদ্র্জিতান্ত্রিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠেছিল এবং তা ছিল পদ্র্জিতন্ত্রের অধিকতর বন্ধাবস্থার একটি অভিব্যক্তি।

পদ্র্জিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায়ের (১৯৫০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে) উৎপত্তি দুটি বিশ্বব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংগ্রামের আবহে, যাতে শান্তিস্থিতি ক্রমেই অধিক পরিমাণে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে ঝুঁকছিল।

পদ্র্জিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায়ের আরও কয়েকটি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যোগ দেয়:

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করে লাতিন আমেরিকা মহাদেশের; প্রথম দেশ, কিউবায়; আর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম একযোগে গঠন করে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ইত্যাদি।

পৃথিবীজন্মের সাধারণ সংকটের এই পর্যায়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানবজাতির বিকাশের এক চূড়ান্ত হেতু হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পুরোপূর্ণ ধসে গেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের আওতায় সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি — অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয়ই — আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের কালের মূখ্য রূপান্তরসাধক শক্তি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এখন বিশ্বের সর্বাধিক গতিশীলভাবে বিকাশমান রাষ্ট্রপুঞ্জ। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের চূড়ান্ত ক্ষেত্রটি অর্থনৈতিক বলয়ে সম্প্রসারিত। লেনিনের ভাষায়: ‘এখন আমরা আমাদের মূল প্রভাব বিস্তার করছি... আমাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতির মাধ্যমে... এক্ষেত্রের সংগ্রাম এখন বৈশ্বিক পরিসর পেয়েছে। একবার এই সমস্যাটি সমাধান করলে আমরা আন্তর্জাতিক পরিসরে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত ভাবে জয়ী হব।’*

*V. I. Lenin, ‘Tenth All-Russian Conference of the R.C.P.(B), May 26-28, 1921. Speech in Closing the Conference, May 28’, *Collected Works*, Vol. 32, 1977, p. 437.

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতির তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বিকশিত হচ্ছে। ১৯৬০-১৯৮৫ সালে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের সদস্য-দেশগুলিতে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫ গুণ এবং বথাক্রমে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে — ২ গুণের কিছু বেশি। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশের জনসংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার এক-দশমাংশ হলেও বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে তাদের অংশভাগ এক-তৃতীয়াংশ।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি সমতুল্যতা অর্জন করেছে। ফলত সাম্রাজ্যবাদের আদেশমূলক কর্মনীতি পরিচালনার সত্যিকার ভিত্তি লোপ পায়, যা তারা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে চেয়েছিল এবং বিশ্বাসনে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ে বাধা দেখা দেয়।

আপন অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামরিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বের সকল জাতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন দেয় এবং শান্তির জন্য, পারমাণবিক-রকেট প্রলয় এড়ানোর জন্য সংগ্রামে সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে।

৩। বর্ধমান অর্থনৈতিক অসঙ্গতি

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উত্তাল অর্থনৈতিক উৎক্ষেপের প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের অবস্থানের সঙ্গে তুলনায় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ছে। ১৯৫০-র দশকের শেষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ অতি-উৎপাদনের চার-চারটি বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৬০-র দশকে পুঁজিতন্ত্রের আর্থ-ফিনান্স ব্যবস্থায় তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। ১৯৭০-র দশকে পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শক্তি ও কাঁচামাল সংকট প্রকট হয়ে উঠেছিল। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক উত্তাল সমুদ্রের কালপর্বে প্রবেশ করেছে। ১৯৭০-র দশকে ‘বন্ধাবস্থা সহ মদ্রাস্ফীতি’ শব্দটি এতটা বহুবিস্তৃত হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। এতে সূচিত হচ্ছে মন্দা বা অতিনিম্ন বৃদ্ধিহারের সঙ্গে সঙ্গে অত্যুচ্চ পরিমাণ বেকারি ও মদ্রাস্ফীতি — এই অশুভ গ্রন্থীই আজ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে তাড়া করে ফিরছে। সাধারণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্জ্যোন্নত সরকারের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সকল চেষ্টাই কার্যত বিফল হয়।

বেকারি বিপুল আকার ধারণ করেছে, উৎপাদনী সামর্থ্যের একটা বড় অংশ ক্রমাগত অবব্যবহৃত হচ্ছে, অনেকগুলি মৌলিক শিল্পে (ধাতু উৎপাদন, মোটরগাড়ি, ইত্যাদি) সংকটাবস্থা দেখা যাচ্ছে, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের গতিবেগ হ্রাস পাচ্ছে। বহুদেশে সরকারী বাজেটে বিরাট ঘাটতি চলছে।

সামাজিক চাহিদার খাতে খরচ যদৃচ্ছা কমান হচ্ছে, অথচ অস্বপ্রতিযোগিতায় ব্যয়বৃদ্ধি চলছেই।

অর্থনৈতিক সমস্যা তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম ও ধর্মঘট আন্দোলনের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুদ্ধোত্তর কালপর্বে ধর্মঘট আন্দোলন পুঁজিতন্ত্রের গোটা ইতিহাসে তুঙ্গে পৌঁছেছে। শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা এবং মেহনতিদের স্বার্থের জন্য সংগ্রামে তার অগ্রদূতকল্প ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যকার এবং সাম্রাজ্যবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যকার বর্ধমান অসঙ্গতির মধ্যেই ফুটে উঠেছে বর্তমান পর্যায়ে পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট গভীর হয়ে ওঠার লক্ষণ।

৪। আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্রত্যেক স্তরে, প্রাপ্ত যাবতীয় উপায় — অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করছে। এই লড়াইয়ে জড়িত রয়েছে ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি ও আপন আপন একচেটিয়াদের স্বার্থের রক্ষক হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। এই অসঙ্গতি সর্বাধিক প্রকটিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাধারণ বাজার ও জাপান সহ গঠিত দ্বিভূজের কাঠামোয় বৈদেশিক বাণিজ্য ও আর্থ-ফিন্যান্স ক্ষেত্রগুলিতে।

মার্কিন একচেটিয়ারা বর্ধমান আশঙ্কায় লক্ষ্য করছে

পশ্চিম ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের দৃঢ়তর সংহতি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিনিীতির বিরুদ্ধে অধিকতর বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতি গ্রহণে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সদস্যদের मदत দিচ্ছে। সাধারণ বাজারের কাঠামোর মধ্যে শুল্কসঙ্ঘ ও সাধারণ শুল্ক-টারিফ প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ার শান্তিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৃষিজাত সামগ্রী ও ধাতুশিল্পের উৎপাদের বাণিজ্যেই বিষমতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, ১৯৮০-র দশকে আবার 'ইম্পাত যুদ্ধ' শুরু হয়েছে। মার্কিন কর্পোরেশনগুলি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর প্রধান ইম্পাত কোম্পানিগুলিকে এই বলে অভিযুক্ত করেছিল যে তারা জলের দরে তাদের উৎপাদগুলি বাজারে ছাড়ছে। মার্কিন সরকার পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দেশগুলি থেকে ইম্পাত আমদানির উপরে অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সরকারী চক্র ইম্পাত ব্যবসা সংক্রান্ত এই বিবাদে দ্রুত যোগ দেয়, কিন্তু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এইসব অসঙ্গতির সমাধান ব্যর্থ হল। অন্যান্য পণ্য-সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ লড়াই ঘটে।

মার্কিন-জাপান অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য — অবিরাম বিরোধ। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত যেসব ব্যাপারে সর্বিশেষ আশীংকিত
 তা হল: মার্কিন-জাপান বাণিজ্যের প্রকট
 ভারসাম্যহীনতা ও জাপানের প্রবল রপ্তানি-উদ্যোগ,
 যাতে বাণিজ্যতৌল জাপানের অন্তর্কূলে আরও বেশি
 ঝুঁকে পড়ছে। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও
 জাপানের মধ্যে বার বার তীব্র সংঘাত ঘটেছে। মার্কিন
 সংস্থাগুলি এমনকি স্বদেশের বাজারেও জাপানী
 পণ্যের সঙ্গে মারাত্মক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। কিন্তু
 মার্কিন সরকারের 'জাপানবিরোধী' সব উদ্যোগই
 জাপানী কোম্পানিগুলির অবস্থান এতটুকুও টলাতে
 পারে নি। উচ্চ-প্রযুক্তি পণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে
 শেষোক্তরা এখন এতটা শক্তিশালী যে জাপানী
 শাসকচক্র বিশ্বের কয়েকটি পণ্যবাজারে তাদের অগ্রণী
 অবস্থান মজবুতের জন্য 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির পক্ষে
 প্রবল প্রচার শুরুর করেছে। এই বিষয়ে মার্কিন
 যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে তীব্রতর অসঙ্গতি
 পুঞ্জিবাদী বাণিজ্যের অন্যতম মূল সমস্যা হয়ে উঠেছে।

আর্থ-ফিনান্স ক্ষেত্রে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী
 অসঙ্গতিগুলি তুঙ্গে পৌঁছেছে। এটা প্রকটিত
 আন্তর্জাতিক মীমাংসার গোটা পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থার
 স্থায়ী বিশৃঙ্খলায়, সদৃশ হার ও স্বল্পমেয়াদী
 ঋণের এলোমেলো বিচলনে, মদ্যার বিনিময়-হার ও
 মদ্যাস্ফীতির অপ্রত্যাশিত ওঠা-নামায়। এই
 অসঙ্গতিগুলিতে বিশেষত আকস্মিক দিকবদল
 ঘটেছিল ১৯৭০-র দশকের গোড়ায় স্বর্ণে মার্কিন
 ডলারের সরকারী বিনিময়যোগ্যতা বাতিলের পর, যা

ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে গৃহীত মদ্রাব্যবস্থার ভিত্তি।

আর্থ-ফিনান্স ক্ষেত্রে সংকটের মূলে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত-একচেটিয়া বাজারের ওঠা-নামা মোকাবিলায় উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির সরকারের ব্যর্থতা।

কাঁচামাল ও শক্তি সংকটের মূল কারণ ছিল একচেটিয়াদের নীতি, যারা চেয়েছিল পুনর্বায়নাতীত সম্পদ থেকে, সর্বোপরি তেল থেকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা সংগ্রহ। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্রের অসঙ্গতি বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি শোষণের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন রয়েছে এই সংকটের ভিত্তিতে। পুঞ্জিতন্ত্রের মূল কেন্দ্রগুলিকে যে-প্রক্রিয়া কাঁচামাল সরবরাহ করত, তা ভেঙ্গে পড়েছিল।

উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশের শিল্পায়নের অত্যুচ্চ স্তর ও এইসঙ্গে জাতীয় সম্পদের যদৃচ্ছা লুণ্ঠনের দরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা সদ্যস্বাধীন দেশগুলির এলাকায় অবস্থিত কাঁচামালের উৎসগুলির দিকে নজর দিয়েছিল। আমাদের কালে এইসব দেশ নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্ন সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে চায় এবং ইতিমধ্যেই তারা তা করেছে। কাঁচামাল ও শক্তি সংকটের অন্তরালবর্তী অন্যতম কারণ ছিল এইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি পশ্চিমা কোম্পানিগুলির নিদারুণ অবহেলা, কাঁচামালের আরও যুদ্ধিসঙ্গত সংগ্রহ বা গভীরতর প্রসেসিংয়ের

জনা অতিরিক্ত পুঁজিলাগ্নি না করে সেগুলির
লুণ্ঠনমূলক ব্যবহার।

জবালানি ও কাঁচামাল সমস্যার ক্রমাবনতির প্রেক্ষিতে
পশ্চিমে প্রধান কাঁচামালের উৎসসমৃদ্ধ উন্নয়নশীল
দেশগুলির বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সংগ্রামে
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক নতুন
জোরদার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে
শক্তিসমূহের সংহতি বিধানের প্রবণতাটি সব সময়
গভীর আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী অসঙ্গতির দরুন খর্বিত
হচ্ছে।

পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের
প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে সাধারণ বাজারের
কর্মপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে ওদের কাঁচামালের উৎসে
নিজেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত কানাডা, লাতিন আমেরিকা
ও মধ্য প্রাচ্যের কোন কোন দেশে — যেখানে মার্কিন
একচেটিয়াদের অবস্থান যথেষ্ট মজবুত — তার
অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পাচ্ছে। জাপান
তার উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত করছে ভারত ও প্রশান্ত
মহাসাগর অঞ্চলে। এইসঙ্গে সব সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা —
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক
গোষ্ঠীর দেশগুলি — তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব-
বলয় ভেদ করার এবং নবীন রাষ্ট্রগুলির ও কোন
কোন উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশেরও খনিশিল্পে
অনুপ্রবেশের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রাণপণ লড়াই
চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের প্রতিটি

ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধাজনক বাজারের পথ, পুঞ্জি
বিনিয়োগের বলয় ও কাঁচামালের উৎসের জন্য অবিরাম
সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে।

১৯৫০-র দশকের শেষে ও ১৯৬০-র দশকের
গোড়ায় বাস্তুসংস্থানিক সমস্যার মারাত্মক অবনতি ঘটে।
প্রতিবেশের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনমূলক
দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বাস্তুসংস্থানিক সংকট দেখা দেয়,
যাতে ফুটে ওঠে মানুষ ও সজীব প্রকৃতির মধ্যকার
জৈব ভারসাম্যের বিপর্যয়। বাতাস ও জল দূষণের
মাত্রা এখন অত্যধিক: শহরগুলিতে বাতাসে
অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে, পানীয় জলের মানও
নিম্নমুখী। বিশ্বসমুদ্র — পৃথিবীর ফুসফুস — দূষিত
হচ্ছে তেল, গুরুদ্রব্য, তেজস্ক্রিয় ও অন্যান্য বিবাক্ত
দ্রব্যের। অরণ্যগুলি — ‘অক্সিজেন কারখানা’ — ধ্বংসের
মুখে, মারাত্মক বিপন্ন এখন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল।
এলোমেলো সড়ক পরিবহণ সংশ্লিষ্ট কোলাহলের
চাপ ও স্নায়বিক চাপ বাড়ছে। প্রতিবেশের প্রতি
একচেটিয়া পুঞ্জির লুণ্ঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন
পৃথিবীতে সমস্ত জীবন্ত বস্তু আজ ধ্বংসের মুখোমুখি।
কেবল গত অর্ধশতকেই পুঞ্জিতান্ত্রিক বিশ্বে শত শত
প্রাণপ্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিংবা অচিরেই
নিশ্চিহ্ন হবে। এমনকি অনেক বুর্জোয়া গবেষকও
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বর্তমানের
পুঞ্জিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ও
সাধারণভাবে মানুষের প্রতিবেশকে ধ্বংস করে।

বাস্তুসংস্থানিক সংকট হল বর্তমান পুঞ্জিতান্ত্রিক

সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের গভীর
অসঙ্গতিমূলক ব্যবহারের একটি লক্ষণ, আজকের
পুঞ্জিতন্ত্রের অবক্ষয়ের একটি অভিব্যক্তি।
বাস্তুসংস্থানিক সংকট পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য
সংকট উৎক্ষেপের উপর আরোপিত হয় এবং তা
পুঞ্জিতন্ত্রের সাধারণ সংকট গভীরতর হওয়ার একটি
বৃদ্ধিসঙ্গত ফলশ্রুতি।

সাম্রাজ্যবাদী দেশে অর্থনৈতিক সংকট কার্যত
কর্মনির্ভীতি ও ভাবাদর্শের সংকটের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবী
সমাজের আর্থিক ও নৈতিক পতনের সঙ্গেও হাত
মিলিয়ে এগোয়। বিষয়টি পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে
আলোচিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

আজকের পুঁজিতন্ত্রের রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া জুড়ে এখন গণতন্ত্র ও প্রগতির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে খোলাখুলি ও ব্যাপক পরিসর আক্রমণ শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যধিক মাত্রায় মেহনতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘন এখন রাষ্ট্রীয় নীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

ভাবাদর্শীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একযোগে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বর্ধমান তীব্রতা এখন স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি একান্ত আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে জীবনের রাজনৈতিক ও

আত্মিক পরিমণ্ডলে বর্ধমান প্রতিক্রিয়া হল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের একটি প্রকটতম অভিব্যক্তি, তার দুরারোগ্য ব্যাধিপুঞ্জের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

১। রাজনীতির সংকট

সাম্রাজ্যবাদী চিন্তকরা একটি নিয়ম সম্পর্কে অনেক খোলাখুলি ও নির্দয় ওকালতি করেন, যাতে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে: একদিকে ব্যাপক জনগণ, যাদের কর্তব্য কাজ করা ও প্রতিবাদহীনভাবে আদেশ মেনে চলা; অন্যদিকে ‘এলিট’, যারা শাসনের (এমনকি বর্বরতম উপায়েও) ও দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারী। এই হল অগ্রণী উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সরকারী নীতির অন্তর্লীন ‘দর্শন’। স্পষ্টতই এই নীতি জনগণের ব্যাপক স্তরের অসন্তোষ ও প্রতিরোধের মূখোমুখি হয়। কোন কোন রাষ্ট্রের সরকারী নেতৃত্বের ঘন ঘন অদল-বদল, অন্যত্র বিদ্যমান চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সরকারী গতিপথ সম্পর্কে বর্ধমান বিরোধিতা, নির্বাচনে যোগদানে অস্বীকৃতি বস্তুত পশ্চিমের রাজনৈতিক আশ্রয় একটি সংকটেরই সাক্ষ্যবহ। জনগণ আগের চেয়ে এখন ভালই বোঝে যে নির্বাচনী অভিনয়, তথ্যাদি নিয়ে সরব ও বিবেকহীন রাজনৈতিক প্রবণতা কার্যত মূখ্য শিল্প-কর্পোরেশন ও ব্যাংকগুলির এক সুপরিকল্পিত ব্যাপার, যারা রাজনৈতিক পিরামিডের চূড়ায় আপন ক্রীড়নকদের বসাতে তৎপর।

মেহনতিরা বার বার আপন অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের ভণ্ডামি সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছে, যারা মেহনতিদের ভাগ্যোন্নয়নের ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু নির্বাচনের পর পর এসব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যায়। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শাসক রাজনৈতিক অভিজাতদের উপর আস্থা কমছে এজন্যও যে এইসব প্রতিনিধিদের অনেকেই ক্ষেত্রব্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অসংখ্য কুকর্ম ও কূটকৌশলের হোতা। সাম্রাজ্যবাদী দেশের অনেকেই যে তাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে ও ‘অবাধ নির্বাচনের’ প্রহসনে শরিক হতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তাতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে সরকারী কার্যকলাপের গণবিরোধী দিকগুলি মেহনতির দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে, তাদের অসন্তোষে ইন্ধন যুগিয়ে ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি মানুষ দুর্ভর হয়ে ওঠা সামাজিক অন্যায়ে মূর্খে আজ নিরুপায়। মানুষ পথে নেমে স্লোগান ও পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদ জানায়, ধর্মঘট করে, কিন্তু এই বিক্ষোভ থামাতে আসে পুলিশ।

অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী দেশে বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক কর্মনীতিও ক্রমেই আরও আক্রমণাত্মক ধারা অনুসরণ করছে। নিকারাগুয়ার সীমান্তে মেশিনগান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে টিয়ারগ্যাস, ধর্মঘটে পিকেটিংকারীদের হাতে পরান হচ্ছে হাতকড়া। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে

‘পেরশিং’ ও ‘ট্রাইডেন্ট’ শব্দগুণি মৃত্যু, ধ্বংস ও বিশ্বপ্রলয়ের সমার্থক হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতির বর্তমান ভিত্তি — সামরিক হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, পারমাণবিক ব্লেকমেইল ও বিশ্বাধিপত্যের দাবি। একথা আর গোপন নেই যে পশ্চিমের অনেক রাজনৈতিক নেতা সর্বশক্তিমান ‘বৃহৎ বণ্টর’ উপরই এই ধরনের নিশ্চিত ভরসা রাখেন ও সেটাকে আরও গুরুভার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূয়ো ‘যুদ্ধপ্রবণতা’ দিয়ে তারা চাপা দেয়ার চেষ্টা করে এবং তাতে এই উদ্দেশ্যে বৃজোয়া সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি প্রতি সপ্তাহে অথবা নষ্ট করেছে টন টন কাগজ ও বহু কিলোমিটার দীর্ঘ টেপ।

সাম্রাজ্যবাদী নীতির হঠকারিতা এবং একচেটিয়া পুঁজির সর্বাধিক যুদ্ধবাজ চক্রগুলির আপন স্বার্থপর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবজাতির পরম স্বার্থ বিপন্ন করার প্রস্তুতি মোটই পুঁজিতন্ত্রের শক্তির লক্ষণ নয়, তার সাধারণ সংকটের প্রকোপ বৃদ্ধিরই নজির। যুদ্ধোন্মাদনা মজবুতি বিধানের বদলে বৃজোয়া দুনিয়ার রাজনৈতিক ভিত্তিকেই ধসায়। এটা জনমনের উত্তেজনা বাড়ায় এবং মানুষকে এই অদ্রাস্ত সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা দেয় যে সামরিক আশঙ্কার সত্যিকার উৎস আসলে সাম্রাজ্যবাদ, যার আছে অসংখ্য থেকে কোটি কোটি ডলার অর্জনকারী সামরিক-শিল্প সমাহার ও দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলি,

সাম্রাজ্যবাদই যা সম্প্রসারণবাদী বৈদেশিক নীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করার মাধ্যমে তার শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রবল অসঙ্গতিগুলি মোকাবিলায় প্রয়াস পায়।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি থাকে গভীর হয়ে ওঠা ভাবাদর্শগত সংকট।

২। সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শের সংকট

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রধান ভাবাদর্শ হল শাসক বর্জেরা শ্রেণীর ভাবাদর্শ। সত্যিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুবাদে পুঁজিপতিরা মেহনতিদের আত্মিকভাবে দাসত্ববন্দী করার জন্য গণমাধ্যমসমূহ ও লভ্য অন্যান্য যাবতীয় উপায় ব্যবহার করেছে।

আমাদের কালের একচেটিয়া বর্জেরা পুঁজিতন্ত্রের ভাবাদর্শগত মূল্যবোধ প্রচারে গৌরবের স্থান দখল করেছে। জনসাধারণের নিয়মিত ‘মগজ-ধোলাই’ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ ও সুবিধা তার রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ প্রচার নাকি জনগণের পক্ষ থেকে ও তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত। একচেটিয়া বর্জেরা তার সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে গোটা জনগণের স্বার্থ হিসাবে উপস্থিত করতে চায় এবং কার্যত তা মেহনতিদের বিপক্ষে চালনার জন্য, কালকে সাদা ও সাদাকে কাল বানানোর জন্য। এভাবে

ধনকুবেররা নিজেদের শোষকের বদলে 'দাতা' হিসাবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের স্বার্থরক্ষকের বদলে 'জাতির শত্রু' হিসাবে দেখাতে চায়।

বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মেহনতিদের চেতনার বিরুদ্ধে নিত্যদিন ভাবাদর্শগত আক্রমণ পরিচালনার জন্য একটি সুদূরপ্রসারী ও শাখাবিস্তৃত জাল সৃষ্টি করেছে এবং তাতে আছে হাজার হাজার সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেতার ও টিভি-স্টেশন।

ধনকুবেরতন্ত্রের স্বার্থে বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলি জনসাধারণের মধ্যে একটি গৎবাঁধা মানসিকতা লালনের চেষ্টায় পূর্ণোদ্যমে জনমতকে কাজে লাগাতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশে গণমাধ্যমের সত্যিকার মালিকরা সাধারণত আড়ালে থেকে সতর্কভাবে অদৃশ্য সুতো টেনে জনমতকে স্বকারণে লাগানোই পছন্দ করে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তারা অপরিণীকৃত গুঁজব ও খোশগল্প, এমনকি ডাहा মিথ্যাও ছাড়ায়, চমক সৃষ্টি করে, প্ররোচনামূলক 'তথ্য পাচার' ঘটায়, একচেটিয়া বুর্জোয়ার পক্ষে অসুবিধাজনক তথ্যগুলি এড়িয়ে চলে বা স্বেচ্ছায় বিকৃত করে (যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অসংখ্য শান্তি-উদ্যোগ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার)।

কিন্তু অত্যাধুনিক মগজ-ধোলাইও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সংকটের ক্রমাবনতি ঠেকাতে পারে না, কেননা খোদ বুর্জোয়াই একদা তার পতাকায় লিখিত

স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে পদদলিত করেছে। জনসাধারণকে আকর্ষণ করার মতো নতুন স্লোগান উদ্ভাবনে বুদ্ধজোয়া চিন্তকদের যাবতীয় চেষ্টা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এজন্যই প্রকট সামাজিক নৈরাশ্যবাদ, এবং প্রগতিতে, মানুষের ও সমাজের সৃজনশীল সম্ভাবনায় অবিশ্বাস। বুদ্ধজোয়া দর্শন, সমাজবিদ্যা ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে বিবিধ ঘরানা ও ধারা থাকলেও এগুণীর কোনটিই জনগণকে আকৃষ্ট করতে, বিশ্ব সম্পর্কে একটি বিষয়গত উপলব্ধির সন্ধান বা কোন স্পষ্ট প্রায়োগিক কর্মসূচি দিতে পারে নি।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অধিকতর সংখ্যক মানুষ ক্রমেই একথা বুঝতে শুরুর করেছে যে বুদ্ধজোয়া ভাবাদর্শের মূল মতবাদ আসলে সত্যিকার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও মেহনতিদের স্বার্থের পক্ষে পরকীয় — তাতেও বুদ্ধজোয়া ভাবাদর্শের সংকট প্রকটিত হয়।

বুদ্ধজোয়া ভাবাদর্শের অন্যতম মুখ্য মতবাদ ছিল এই দাবি যে ব্যক্তিগত মালিকানা 'চিরস্থায়ী'। ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি প্রত্যাখ্যানকারী যেকোন ধরনের সামাজিক সংগঠন বুদ্ধজোয়া ভাবাদর্শে সরাসর প্রত্যাখ্যাত হত। এমনকি আজও তারা প্রাণপণে একথা বোঝাতে চায় যে স্বল্পায়ুই ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজের অনিবার্য ভবিষ্যৎ এবং পুঁজিতন্ত্র মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর। কিন্তু বিশ্ব এখন এই ধরনের দাবির প্রতারণা সম্পর্কে অনেক বেশি নিঃসন্দেহ। আমাদের কালে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায়

এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যতিরেকে, পুঁজিতন্ত্র ও মানুষ কতৃক মানুষ শোষণ ছাড়াই বসবাস করছে, ইতিপূর্বে পুঁজিতন্ত্রের আওতাধীন থাকা কালের তুলনায় অনেক ভালভাবেই রয়েছে।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আরেকটি বহুল প্রচারিত মতবাদ এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে যুদ্ধ মানবজাতির মজ্জাগত ব্যাপার। এই অভিযোগ সত্যাপনের জন্য অসংখ্য তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। শোষক শ্রেণীর ভাবাদর্শীরা যুদ্ধকে সর্বদাই অপরিহার্য হিসাবে, চিরন্তন ঘটনা হিসাবে ন্যায়সঙ্গত বলেছেন ও এখনো বলছেন। এমন বহু তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়। কেউ কেউ যুদ্ধকে এই বলে ব্যাখ্যা করেন: যুদ্ধ হল 'আক্রমণের প্রতি মানুষের জৈবিক ঝোঁক', 'সহিংসতার বংশানুসৃত সংকেত', 'জাতিসমূহের মধ্যে জৈবিক বৈরিতা', 'পৃথিবীর জনাধিক্য'। অন্যদের মতে যুদ্ধ 'আক্রমণ ও ধ্বংসের জন্মগত অবচেতন প্রবৃত্তির' সঙ্গে বা বিবিধ সামাজিক প্রতীতি ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। কোন কোন বুর্জোয়া ভাবাদর্শী 'ভৌগোলিক উপাদান', সীমিত এলাকা, কাঁচামাল ও শক্তি-উৎসের উপর গুরুত্ব আরোপের নিরিখে যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করেন।

বর্তমান বুর্জোয়া যুদ্ধতত্ত্বগুলি বর্ণনার ভাষা যত বিভিন্নই হোক না কেন তাতে সর্বদাই সম্পৃক্ত থাকে বর্ণবাদী, জাতিদন্তী ভাবধারা, মানবিক বিচারবুদ্ধিতে আস্থার অভাব। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বাবলী কেবল একটি উদ্দেশ্যই পূরণ করতে পারে:

যুদ্ধের, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতির
 যথার্থ্য প্রতিপাদন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি
 একচেটিয়া বুদ্ধিজীবীর স্বার্থসর্বস্ব পরিকল্পনার কোন
 অংশ নয়। এর উদ্দেশ্য পুরোপুরি পৃথক: সংগ্রামের
 জন্য মদ্যখোঁদা হওয়া, উত্তেজনা বৃদ্ধি, সমাজতন্ত্র ও
 জাতীয় মদ্য আন্দোলনের অবস্থানের ক্ষতিসাধন এবং
 সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ — বিশ্বাধিপত্যের পথসন্ধান।

কিন্তু যুদ্ধের ন্যায্যতা অপ্রামাণ্য, অনর্দিতও! দুনিয়ার
 মানুষ আজ আরও পূর্ণোদ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী
 আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাখ্যান করে। যুদ্ধ হল এককভাবে
 শোষণমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের একটি
 মজ্জাগত ব্যাপার।

বুদ্ধিজীবী ভাবাদর্শ ও সমাজ-উন্নয়নের জরুরি
 চাহিদার মধ্যকার বর্ধমান ফারাক তার প্রতিক্রিয়াশীল,
 অমানবিক প্রকৃতির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির সহায়ক। এটাই
 সর্বশেষ প্রকটিত উন্মত্ত কমিউনিজমবিরোধিতায়,
 জাতিদম্ভবাদে ও বর্ণবৈষম্যবাদে।

কমিউনিজমবিরোধিতা উদ্দীপনের মাধ্যমে একচেটিয়া
 বুদ্ধিজীবী ভাবাদর্শগত কানাগলি থেকে বেরোনের
 একটি পথ খুঁজছে। জনমনে কমিউনিস্টবিরোধী
 ভাবাদর্শ সৃষ্টিই এর অভীষ্ট, যা সমাজতান্ত্রিক ধারণা
 ও আদর্শকে প্রশমিত করবে, যেগুলি পুঁজিতান্ত্রিক
 দেশের অধিক সংখ্যক বাসিন্দাদের মধ্যে ক্রমেই
 অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদী
 রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্টবিরোধী গবেষণার পরিসর
 বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে

সমাজতন্ত্রবিরোধী ‘গবেষণা কেন্দ্র’ এবং গণমাধ্যমের আরও হিংস্র, কুৎসামূলক উচ্চকণ্ঠ অপপ্রচার। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে কমিউনিজমবিরোধিতা কার্যত প্রগতিশীল পার্টি ও প্রতিষ্ঠানগুলির অবদমন ও নির্যাতনের নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপুল সাফল্য গোপন রাখার ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা ওগুলির গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করছেন এবং প্রমাণ করতে চাইছেন যে পুঁজিতন্ত্রও অভিন্ন চমকপ্রদ সামাজিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম। তারা চাতুপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এখন জনগণের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। এই আকর্ষণ কমানোর জন্য বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা এমন ধারণা বিশদ করেন যে পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধ যথাসময়ে মীমাংসিত হবে, তাদের মধ্যকার ফারাক কমবে এবং একদিন পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক অভিন্ন সমগ্রে মিলিত হবে। এই ধরনের রূপকথা, যাতে কেবল অলীক কল্পনাই জন্মায়, তার একটি লক্ষ্য রয়েছে: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে মেহনতিদের বিপথগামী করার চেষ্টা। একইসঙ্গে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা চেষ্টা করেন জনগণকে ভোগবাদের আদর্শ গছাতে এবং অর্থলোভ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদী মোঁতাত ধরাতে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিশীল জাতীয়তাবাদ, জাতিদম্ববাদ ও বর্ণবাদের বিষাক্ত আগাছার এক উর্বর

অকুস্থল। একচেটিয়া বুদ্ধিজীবীরা সম্ভাব্য সর্বোপায়ে এতে উসকানি দেয় এবং তা কেবল সংখ্যালঘুদের জাতীয় নির্যাতন ও বর্ণবৈষম্য তীব্রতর করার জন্যই নয়, জনগণকে সামাজিক অন্যায়চরণ থেকে, সত্যিকার অপরাধীর — একচেটিয়া পুঁজির — বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিপথগামী করার জন্যও। জাতীয়তাবাদের অদৃশ্য বিষ উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সর্বক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবিষ্ট, তাতে সহজতর হচ্ছে নাগরিক স্বাধীনতা সংকোচনের, প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিক্রিয়ার অবস্থান মজবুতের ও সমরবাদী উন্মত্ততার অনুকূল আবহ সৃষ্টি।

বিচারশক্তির ও যুক্তিনিষ্ঠ মানবিক চিন্তার প্রতি বর্ধমান অনাস্থা সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী ভাবাদর্শের সংকটের আরেকটি রূপ — চরম ধর্মাত্মতা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিস্তার যোগদান তাদের অনুসারীদের ‘পরম স্বর্গসুখ’ লাভের পথ দেখায়।

পশ্চিমা সংস্কৃতির সংকটের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ভাবাদর্শের সংকট আরও সহজলব্ধ। ‘বারোয়ারি সংস্কৃতি’র প্রত্যয় এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশে বহুব্যাপ্ত। এই তথাকথিত ‘সংস্কৃতি’র উদ্দেশ্য অতি অবাঞ্ছিত রুচি পরিবেশন এবং যার সঙ্গে সত্যিকার সংস্কৃতির কোনই সম্পর্ক নেই। এই ‘সংস্কৃতিতে’ মানবতাবাদের আদর্শ সেকেলে বলে অম্বীকৃত এবং তা অর্থ, যৌনতা ও হিংস্রতার উপাসক। বইয়ের দোকান, টিভি ও চলচ্চিত্রের পর্দাগুলি বোঝাই হয়ে আছে নিম্নমানের সৃষ্টিতে, যাতে থাকে নির্মমতা, হিংস্রতা ও

নীতিহীনতার প্রশস্তি, আদিম প্রবৃত্তির সদৃশসুদৃশ।
চিত্রশিল্পের প্রাধান্য পাচ্ছে নৈরাজ্যিক প্রবণতা,
ভাস্কর্যে দানবীয়তা, সঙ্গীতে প্রায়শই বন্য হল্লা।

৩। নৈতিকতা ও আইনের সংকট

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংকটের পাশাপাশি রয়েছে সদাচার ও নীতিবোধের সংকট এবং এগুলি নিম্নোক্ত সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার মধ্যে লক্ষণীয়: পরিবার ও সাধারণভাবে সমাজের প্রতি আকর্ষণের অভাব, ব্যক্তিত্বের বিবিধ বৈকল্য, যা দ্বায়ুভঙ্গ, অপরাধ, আত্মহত্যা থেকে সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি অবধি পৌঁছয়।

নৈতিক সংকটে বিশেষভাবে আলোড়িত হয় তরুণ প্রজন্ম, তারা বুর্জোয়া সমাজের কপটতা, ভণ্ডামি ও নৈতিকতার সঙ্গে আপসে অস্বীকৃত হয়, এগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মোহভঙ্গকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শরা নানা জৈবিক হেতুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান: তাদের শারীরিক ও যৌনতার অকাল বিকাশ — তাতে ফারাক সৃষ্টি হয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অন্তর্জগতের মধ্যে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদী দেশে তরুণদের মধ্যে অসন্তোষের হেতু জৈবিক নয়, স্পষ্টতই সামাজিক। এটা কেবল তরুণদের মধ্যে বর্ধমান বেকারি, পেশাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অসন্তোষজনক পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মতো বৈষয়িক হেতুজাত নয়, ভাবাদর্শগত উপাদান থেকেও উৎপন্ন, যেমন — প্রধানত শাসকচক্র ও তাদের তাত্ত্বিকরা তরুণদের এমন কোন মূল্যবোধ ও প্রকল্প এবং সমাজবিকাশের এমন কোন পথ দেখাতে পারেন না যা তাদের সম্মুখবদ্ধ করবে, তাদের সৃজনশীল শক্তিকে উদ্দীপ্ত করবে।

গত কয়েক দশকে পুঁজিবাদী বিশ্বে যুদ্ধ ও সমরবাদের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক সংস্কার ও কাজ পাওয়ার সত্যিকার অধিকারের দাবিতে তরুণদের নাজিরবিহীন ব্যাপক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা গেছে। বুদ্ধোন্মত্তরা এই ধরনের আন্দোলনকে আজকের বুদ্ধোন্মত্ত সমাজের প্রতি তরুণদের বর্ধমান অসন্তোষের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করে। এগুঁলি হল এই সমাজের সামাজিক অন্যায়, অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্য। তাই, প্রগতিশীল যুবসংগঠন ও তাদের সক্রিয় কর্মীরা — যারা প্রতিবাদ মিছিল ও ছাত্র-আন্দোলনের শরিক — তারা কর্তৃপক্ষের ভীতিপ্রদর্শন ও নির্যাতনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। সেজন্যই বুদ্ধোন্মত্তরা যুবজনের প্রতিবাদ প্রশমনে কিংবা অন্ততপক্ষে কম ক্ষতিকর কোন ধারায় সেগুঁলি চালনার জন্য এতটা তৎপর।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে পুঁজিপতিরা যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: যুবজনের মধ্যে ভোগবাদী তৃষ্ণা লালন, মর্যাদার সূচক হিসাবে পণ্যসংগ্রহের প্রতিযোগিতা এবং

এভাবে তাদের ভোগবাদের পঞ্চভূমিতে টেনে নামান ও সজ্ঞান আত্মিক চিন্তার জন্য ক্রমাগত সময়ভাব ঘটান। পণ্য যেহেতু অর্থের ক্ষেত্রে সেজন্য যুবজনকে বিস্তৃপদ্য উপদেশ খয়রাত করা হয়। অর্থ সাফল্যের উৎস বিধায় যুবজন জীবনে সাফল্য লাভে যেকোন মূল্যে কর্মজীবনে উন্নতির জন্য নাকি প্রস্তুত রয়েছে। যেকোন মূল্যে সাফল্য ও সম্পদ! — এই স্লোগানটিই সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা যুবমনে দৃঢ়বদ্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছে।

যুবজনের বিশিষ্ট মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে তাদের আবেগাপন্ন ধারণাগুলি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীরা অবহিত। প্রায়শই 'উপাস্য পাত্র', পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভূয়া দেবতার সাহায্যে যুবজনের উপর বুদ্ধিজীবী আত্মিক মূল্যবোধ চাপান হয়। পশ্চিমা সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি একযোগে পপ-সঙ্গীত, সিনেমা ও ক্রীড়ায় উপাস্য পাত্র সৃষ্টিতে কাজ করে, তাদের পূজা ও অনুকরণে তরুণদের প্ররোচিত করে। তাদের একথা বোঝান হচ্ছে যে তারাও এই অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে এবং চুড়ায় ওঠার পথে প্রয়োজনবোধে অন্যকে ঠেলে ফেললেও অনুশোচনার কিছু নেই।

উপাস্য পাত্রগুলি এক ও অভিন্ন ব্যবস্থাপন অনুযায়ীই তৈরি, তাতে থাকে এইসব উপকরণ: খ্যাতি, বিস্তৃ, যৌনাবেদন, কিছু 'কৌতূহলপ্রদ দুর্বলতা' — যেমন মদ বা ড্রাগের প্রতি আসক্তি, নির্বিচার যৌনসম্ভোগ, কিংবা আইনভঙ্গের প্রবণতা।

উপাস্য পাত্রসৃষ্টি মোটেই কোন খেলা নয়, যুবজনদের লক্ষ্যে অনুসৃত বুদ্ধজ্যোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মনীতি। এর উদ্দেশ্য — তরুণদের সামাজিক সংগ্রাম থেকে, সাম্য ও ন্যায়বিচারের আদর্শ থেকে সরিয়ে নেওয়া, তাদের মধ্যে অবাস্তবপ্রায় অধ্যাস সৃষ্টি, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দিবাম্বপ্ন হিসাবে, বাস্তব জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থাকে।

বুদ্ধজ্যোয়ারা তথাকথিত ‘যুব সংস্কৃতির’ — যা নাকি এককভাবে যুবজনেরই — সাহায্যে তাদের মানসিকতা গড়ে তোলার পূর্ণোদ্যম চেষ্টা চালাচ্ছে। আসলে তা ‘বারোয়ারি সংস্কৃতি’ থেকে তেমন কিছু আলাদা নয় এবং প্রায়শই এটিরই অংশবিশেষ। ‘যুব সংস্কৃতির’ লক্ষ্যও অব্যাহত ভোগবাদ এবং যৌনতা, হিংস্রতা, বেপরোয়া উল্লাসে এবং ‘বারোয়ারি সংস্কৃতির’ নকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্থাপিত। ‘যুব সংস্কৃতির’ বিস্তার এমন একটি বিশ্ববীক্ষা চর্চায় সাহায্য যোগায় যা বুদ্ধজ্যোয়া ভাবাদর্শের মূল ধারার সঙ্গে অত্যন্ত মানানসই। জীবনের অর্থ নিহিত আরাম-আয়েশ আর আমোদ-প্রমোদে — এইতো ‘যুব সংস্কৃতির’ আদর্শ। এখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, সামাজিক সমস্যা ও বর্তমান সমাজের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তাভাবনার কোন অবকাশ নেই, আসল কথা রক-সঙ্গীত বা শিথিল জীবনের মোতাতে বাস্তবতা ভুলে থাকা।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের আত্মিক সংকট এখন তার সবগুণী স্তরেই বিস্তৃত। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে বুদ্ধজ্যোয়া সমাজ সম্পর্কে জনগণের বর্ধমান

দূরত্ব ও পরকীয়তা, বেকারির দ্দুর্ভর বোঝা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সহ আশা ও মৌল লক্ষ্য হীনতার দরুনই ড্রাগের ব্যাপক অপব্যবহার ঘটছে, যা এখন প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশের পক্ষে একটি সত্যিকার যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে।

একচেটিয়া বুদ্ধিজীয়া মোটামুটি ড্রাগ ও মদের অত্যধিক অপব্যবহার অব্যাহত রাখতে চায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাগখোর ও মদ্যাসক্তের সংখ্যা ৩ কোটি পেরিয়েছে এবং এদের প্রায় ৫ লক্ষ নিয়মিত সবচেয়ে মারাত্মক ড্রাগ, হেরোইন নিয়ে থাকে। জাপান ও পশ্চিম ইউরোপেও ড্রাগখোরদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

ড্রাগ-আসক্তি বিস্তার হল নির্যাতিতদের সামাজিক ক্রোধ থেকে বুদ্ধিজীয়াদের আত্মরক্ষার একটি উপায়। কিন্তু একইসঙ্গে তা অভ্যন্তরে ভাঙ্গন ধরিয়ে বুদ্ধিজীয়া সমাজের অবক্ষয় ঘটায়, কেননা এই ব্যাধিটি জনগণের সর্বস্তরে ছড়ায়: বেকার থেকে সাধারণ সেপাই ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে ড্রাগের বর্ধমান অপব্যবহার অপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কোটি কোটি অঙ্কের মুনামা লাভের তাড়নায় দুষ্টকারী দঙ্গলগর্দলি হাজার হাজার লোক সহ আন্তঃমহাদেশীয় ড্রাগ-ব্যবসার একটি জাল গড়ে তুলেছে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে নেশাদ্রব্যই ব্যাপক অপরাধ ও হিংস্রতা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়; এর উৎস বুদ্ধিজীয়া সদাচার ও নীতিবোধের সংকট।

বলা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপরাধের ক্ষেত্রে বিশ্বে সর্বাগ্রগণ্য। বিশ শতকে দৃষ্টান্তকারীরা ৮ লক্ষাধিক মার্কিন নাগরিককে হত্যা করেছে। সংখ্যাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব যুদ্ধে নিহতদের চেয়ে কয়েক লক্ষ বেশি। মার্কিন দেশের বড় বড় শহরের মানদুঃ নিরন্তর ভয়ের মধ্যে বসবাস করে, কেননা সেখানে অপরাধের মহামারী চলছে। বর্ধমান অপরাধ জনগণের ভয় ও উৎকণ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ।

বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশেই অপরাধীদের সংগঠিত বৃহৎ দল — মافیয়া — সক্রিয়। এই সংস্থার বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এক বছরে নিউ ইয়র্ক স্টক-এক্সচেঞ্জে বিক্রীত স্টক ও শেয়ারের মোট মূল্যের চেয়ে বেশি। মার্কিন বিচার বিভাগের সতর্ক হিসাব অনুযায়ীও অঙ্কটি ১২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

প্রসঙ্গত মার্কসের একটি উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য। তিনি বলেছিলেন: ‘আপন দৃর্দশা না কমিয়ে যে-সমাজব্যবস্থা সম্পদ বৃদ্ধি করে, এবং মোট জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর অপরাধের সংখ্যা বাড়ায় তার মর্মবস্তুর্তে অবশ্যই দূষিত কিছুর থাকে।’*

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়, কেননা সামাজিকভাবে অন্যায় খোদ বর্জেরা

* Karl Marx, ‘Population, Crime and Pauperism’, in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 16, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 489.

ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। দৃষ্টান্তহীন অপরাধ বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের ও বিশেষভাবে বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থার বর্ধমান সংকটেরই একটি ভীতিজনক লক্ষণ।

কোন দুর্বৃত্ত-সর্দার মারাত্মক অপরাধে দু'থেকে তিন বার পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও 'প্রভাবশালী বন্ধুদের' সদিচ্ছার দৌলতে মাত্র কয়েক বছর পরই সে মুক্তি পায়। কেন তা সম্ভব? পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে যেখানে সবকিছুরই ক্রয়-বিক্রয় চলে সেখানে জেল থেকে মুক্তিক্রয়ও সম্ভবপর বটে।

বুর্জোয়া নৈতিকতা ও আইন, ভাবাদর্শ ও রাজনীতির সংকট কেবলই গভীরতর হচ্ছে।

বুর্জোয়া জীবনধারার আদর্শগুণি মানুষের মন থেকে ক্রমাগত খসে পড়ছে। জনগণের মধ্যে সমাজের নিশ্চিত পুনর্গঠনের জন্য এখন ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টিগুণি সমাজের অগ্রদূত হিসাবে ব্যাপকতর স্বীকৃতি লাভ করছে। বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বর্ধমান পরিসর হল মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট গভীরতর হওয়ার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

বিশ শতকে পুঁজিতন্ত্র মানবজাতির অধিকাংশের উপর তার অখণ্ড প্রভাব হারিয়েছে এবং বিশ্বে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের প্রভাব-বলয় যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে। পুঁজিতন্ত্র তার অনিবার্য পতনের দিকে সরাসর এগিয়ে চলেছে।

টীকা ও ব্যাখ্যা

অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট — পুঁজিতান্ত্রিক চক্রের একটি পর্ব, যার বৈশিষ্ট্য হল সামগ্রীর অতি-উৎপাদন, ব্যাপক বেকারি ও শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি।

অতিরিক্ত উদ্ধৃত-মূল্য — একজন একক পুঁজিপতির শিল্পোদ্যোগে উৎপন্ন পণ্যের আলাদা একক মূল্য যখন সেই পণ্যের সামাজিক মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন সেই পুঁজিপতি যে বাড়তি উদ্ধৃত-মূল্য উপযোজন করে।

অন্যোপেক্ষিক উদ্ধৃত-মূল্য — কর্ম-দিবসের বিস্তৃতি বা শ্রম-নিবিড়করণের মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্ধৃত-মূল্য।

অর্থ — একটি বিশেষ পণ্য, যা পণ্যসমূহের বিনিময়ে এক সর্বজনীন তুল্যমূল্যের ভূমিকা পালন করে।

অর্থনীতি — উৎপাদন সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামগ্রিকতা, সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

অর্থনৈতিক নিয়মসমূহ — মানবসমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ নিয়ামক বিষয়গত নিয়মগুলি।

অর্থনৈতিক স্বার্থ — মানবিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়গত চালিকাশক্তি, উৎপাদনের ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির স্থানমর্যাদা এবং তার বৈষয়িক চাহিদার মধ্যকার সম্পর্কে তা প্রকাশ করে।

অর্থ-পুঁজি — পুঁজিতে রূপান্তরিত অর্থের একটি অংক, অর্থাৎ যে-মূল্য উৎকৃষ্ট-মূল্য সৃষ্টি করে এবং মজুরিশ্রম শোষণে ব্যবহৃত হয়।

অর্থমুদ্রাগত সংকট — পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরিক অর্থমুদ্রা-ক্রেডিট ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থমুদ্রাগত-আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে প্রচণ্ড গোলযোগ।

অস্থির পুঁজি — পুঁজির যে-অংশটিকে নিয়োগকর্তা ব্যবহার করে শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

আদিম সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা — মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, যখন উৎপাদনের ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে আলাদা এক একটি কমিউনের যৌথ মালিকানা, যা সেই যুগের অন্তিমত, আদিম উৎপাদনী শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট-মূল্য — আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করা ও তার সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুন উৎকৃষ্ট শ্রম-সময় বাড়ানোর ফলে আদায়-করা উৎকৃষ্ট-মূল্য।

আপেক্ষিক জনাধিক্য — পূর্জিপতিদের দিক থেকে শ্রমশক্তির চাহিদার তুলনায় শ্রমজীবী জনসমষ্টির এক আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত।

আবশ্যকীয় উৎপাদ — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রটিতে শ্রমজীবী জনগণের উৎপন্ন সামাজিক উৎপাদের অংশ, যেটি মেহনতি ব্যক্তি ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, তার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আবশ্যকীয় শ্রম — আবশ্যকীয় উৎপাদ উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম।

উৎপাদন প্রণালী — উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত ভোগের জন্য, উৎপাদনের উপায় উৎপাদন ও ভোগের সামগ্রী উৎপাদনের জন্য মানুষের যে বৈষয়িক মূল্যগুণি প্রয়োজন হয়, সেগুণি উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত প্রণালী। এটা উৎপাদনশী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্য।

উৎপাদন সম্পর্ক — বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এগুলির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সম্পর্ক।

উৎপাদনশী শক্তি — সমস্ত উৎপাদনের উপায় এবং যারা তাদের অভিজ্ঞতা ও শ্রমদক্ষতা দিয়ে সেগুণিকে চালু করে সেই মানুষের ঐক্য।

উৎপাদনের দাম — পূর্জিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি পণ্যের দাম, যা উৎপাদন-ব্যয় যোগ গড় মূল্যফার সমান; পণ্যমূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ।

উৎপাদনের নৈরাজ্য — অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার অবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও

অনুপাতহীন বিকাশ; উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে তা সহজাত।

উদ্ভূত উৎপাদ — শ্রমজীবী জনগণের সৃষ্ট আবশ্যকীয় উৎপাদের উপরে ও তদতিরিক্ত সমস্ত বৈষয়িক মূল্য।

উদ্ভূত-মূল্য — মজুরি-শ্রমিকের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট তার শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে ও তদতিরিক্ত মূল্য যা পুঁজিপতি উপযোজন করে।

উদ্ভূত-মূল্যের হার — পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা; শতাংশে প্রকাশিত উদ্ভূত-মূল্য ও অস্থির পুঁজির অনুপাত।

উদ্ভূত-শ্রম — উদ্ভূত উৎপাদ সৃষ্টি করার জন্য বৈষয়িক উৎপাদনে শ্রমজীবী জনগণের ব্যয়িত শ্রম।

উপনিবেশবাদ — অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলির জাতিসমূহকে প্রত্যক্ষ দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতি।

ঋণের পুঁজি — অর্থ-পুঁজির মালিক এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অন্যান্য পুঁজিপতিকে যে অর্থ-পুঁজি ব্যবহার করতে দেয়, শেষোক্তরা সুদের রূপে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে।

একচেটিয়া দাম — একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্থিরীকৃত বাজারদামের একটি রূপ, যা তাদের একচেটিয়া মুনাবা দেয়।

একচেটিয়া সংস্থা, পুঁজিতন্ত্রী — একটি বৃহৎ পুঁজিতন্ত্রী কোম্পানি (বা অনেকগুলি কোম্পানির পরিমেল), যা একচেটিয়া উচ্চ মুনাবা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন উৎপাদের উৎপাদন ও বিপণনের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

কমিউনিজম — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক এক সামাজিক গঠনরূপ, যা উৎপাদনী শক্তিগুলির বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়; তা হল মানবজাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতির সর্বোচ্চ পর্যায় এবং পূর্জিতন্ত্রকে তা প্রতিস্থাপিত করে। এর দুটি পর্ব আছে: সমাজতন্ত্র, নিম্নতর পর্ব, এবং সম্পূর্ণ কমিউনিজম, উচ্চতর পর্ব।

কর — ব্যক্তি, উদ্যোগ ও সংগঠনগুলির কাছ থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের অংক।

খাজনা — উদ্যোগমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন পুঁজি, জমি বা অন্য সম্পত্তি থেকে পাওয়া নিয়মিত আয়।

জমির খাজনা — কৃষিতে সাক্ষাৎ উৎপাদকদের দ্বারা সৃষ্ট ও ভূস্বামীর দ্বারা উপযোজিত উদ্ধৃত উৎপাদের একটি অংশ।

জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি — বড় বড় উদ্যোগ সংগঠিত করার একটি রূপ, যেগুলির পুঁজি আসে স্টক ও শেয়ার বিক্রয় থেকে।

জাতীয় আয় — এক নির্দিষ্ট কালপর্বে (সাধারণত এক বছরে) দেশে সৃষ্ট নতুন মূল্য।

দাম — একটি পণ্যমূল্যের অর্থমুদ্রাগত অভিব্যক্তি।

দাসপ্রথাধীন ব্যবস্থা — মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণীগত বৈরমূলক গঠনরূপ, যার ভিত্তি উৎপাদনের উপায় ও খোদ শ্রমিকের উপরেই — দাসের উপরেই — ব্যক্তিগত মালিকানা, মানদ্বের উপরে মানদ্বের শোষণ।

দুরারোগ্য বেকারি — পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিরন্তর ব্যাপক বেকারি, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের কালপর্বে তা পুঁজিতান্ত্রিক চক্রের প্রত্যেকটি পর্বে থাকে।

ধনকুবেরতন্ত্র — মৃষ্টিমেষে কিছু সর্ববৃহৎ পুঁজিপতি, যারা শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির মালিক এবং শীর্ষস্থানীয় উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যারা কার্যত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চালায়।

নয়া-উপনিবেশবাদ — যে সমস্ত ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা লাভ করেছে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যবহৃত সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও ভাবাদর্শগত উপায়।

পণ্য — ব্যক্তিগত ভোগের পরিবর্তে বিক্রয়ের জন্য উদ্ভিষ্ট শ্রমের উৎপাদ।

পুঁজি — আত্ম-সম্প্রসারণশীল মূল্য, বা যে-মূল্য মজদুর-শ্রম শোষণের মধ্য দিয়ে উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজি হল এক নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদনের উপায়ের মালিক পুঁজিপতিদের শ্রেণী আর উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত ও নিজের শ্রমশক্তি পুঁজিপতির কাছে বিক্রয় করে বেঁচে থাকতে বাধ্য প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সম্পর্ক।

পুঁজি রপ্তানি — একচেটিয়া সংস্থাগুলির ও ধনকুবেরতন্ত্রের মনোফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জন্য বহুবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপকার ও সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ।

পুঁজি সঞ্চয়ন — উদ্ধৃত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

পুঁজিতন্ত্র — শেষ শোষণমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, যার উদ্ভব হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের উদরে এবং সমাজতন্ত্র যাকে প্রতিস্থাপিত করে। এর ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা ও মজদুর-শ্রম শোষণ।

পুঁজিতন্ত্রে আবশ্যিকীয় শ্রম-সময় — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের এক তুল্যমূল্য উৎপন্ন করে।

পুঁজিতন্ত্রে উদ্ধৃত শ্রম-সময় — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে।

পুঁজিতন্ত্রে বার্ণিজ্যিক মুনামা — উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মজদুর-শ্রম সৃষ্ট উদ্ধৃত-মূল্যের একাংশ, যা বার্ণিজ্যিক পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে।

পুঁজিতন্ত্রে মজদুর — শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ।

পুঁজিতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা — বুর্জোয়া সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ, যেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্র, 'সর্বমোট পুঁজিপতি', উৎপাদনের উপায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক।

পুঁজিতন্ত্রে সদ্ম — উদ্ধৃত-মূল্যের যে অংশটি বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি (শিল্পপতি বা বণিক) ঋণদাতা পুঁজিপতিকে দেয় তার অর্থ-তহবিল এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার করার জন্য।

পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি — সামাজিক উৎপাদন আর শ্রমের উৎপাদগুলির ব্যক্তিগত-পুঁজিতান্ত্রিক উপযোজনের মধ্যে অসঙ্গতি।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট — সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক পতনের কালপর্ব, যখন বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিতর থেকে ভাঙতে থাকে এবং নতুন নতুন দেশ সেই ব্যবস্থার বাইরে চলে যায়, বিশ্বব্যাপী পরিসরে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামের কালপর্ব।

পুঁজিতান্ত্রিক সংহতি — যে প্রক্রিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মিলিত হয়, তা রূপ নেয় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চুক্তির, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ পূরণ।

প্রতিযোগিতা — পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণনে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থার জন্য ব্যক্তিগত পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে বৈরমূলক সংগ্রাম।

প্রলেতারিয়েত — পুঁজিতন্ত্রে মজদুর-শ্রমিকদের শ্রেণী।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি — পুঁজিতন্ত্রে প্রলেতারিয়েতের জীবনমানের অবনতি, যা প্রকাশ পায় তাদের কাজের, জীবনের ও সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক অবনতির মধ্যে।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি — বর্ধমান ধনী বর্জ্য শ্রেণীর তুলনায় প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি। জাতীয় আয়, সর্বমোট সামাজিক উৎপাদ ও জাতীয় সম্পদে প্রলেতারিয়েতের ভাগটা কমে যাওয়ার মধ্যে তা প্রকাশ পায়।

ফিনান্স পুঁজি — ব্যাংকিং একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে একাঙ্গীভূত শিল্প একচেটিয়া পুঁজি।

বনিয়াদ ও উপরিকাঠামো — সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক-

কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক, উৎপাদন সম্পর্ক হল সমাজের বিনিয়াদ, আর সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়ানো ও তার দ্বারা নির্ধারিত ভাবধারণা, ভাবাদর্শগত সম্পর্ক, আইনগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল উপরিকাঠামো।

বাণিজ্য — পণ্যসমূহের ক্রয় ও বিক্রয়ের রূপে শ্রমের উৎপাদগুলির বিনিময়।

বাণিজ্যিক পুঁজি — যে পুঁজি শিল্প-পুঁজি থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং যার প্রধান কাজ হল মূল্যবান লাভের জন্য সামগ্রী বাজারজাত করা।

বিপ্লব, সামাজিক — সেকেলে সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং এক নতুন ও আরও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

বুর্জোয়া শ্রেণী — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শাসক শ্রেণী, যারা প্রধান উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং মজদুর-শ্রম শোষণ করে বেঁচে থাকে।

বেকারি — পুঁজিতান্ত্রিক সহজাত এক ব্যাপার, এতে সক্ষমদেহ জনসমষ্টির একটা বড় অংশ চাকরি পেতে পারে না এবং এক সংরক্ষিত শ্রমিকবাহিনী গঠন করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য — অন্যান্য দেশের সঙ্গে একাধিক দেশের বাণিজ্য, সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহের আমদানি ও রপ্তানি।

ব্যাংক — যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাময়িকভাবে মূল্য অর্থসম্পদকে নিজেদের কাছে কেন্দ্রীভূত করে এবং ঋণ ও ক্রেডিট হিসেবে তা লভ্য করে তোলে।

ভাবাদর্শ — রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য অভিমত ও ধ্যানধারণার এক অভিন্ন মততন্ত্র, যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় সামাজিক সম্পর্ক। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে ভাবাদর্শের একটা শ্রেণী চরিত্র থাকে।

মজুরি-শ্রম — পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমজীবী জনগণের শ্রম; তারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য।

মানুষের উপরে মানুষের শোষণ — উৎপাদনের উপায়ের যারা মালিক তাদের দ্বারা সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্ধৃত শ্রমে ও কখনও বা তাদের আবশ্যকীয় শ্রমের একাংশ দিয়েও উৎপন্ন উৎপাদগুলির পারিশ্রমিকহীন উপযোজন।

মুদ্রা বা কারেন্সি — কোন দেশের অর্থমুদ্রাগত একক (যেমন ফরাসী ফ্রাঁ বা মার্কিন ডলার); আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যবহৃত অর্থের মোট পরিমাণ (বৈদেশিক মুদ্রা নামেও পরিচিত)।

মুদ্রাস্ফীতি — বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনের তুলনায় সংলগ্নে কাগজী অর্থের অতিরিক্ততা, যার ফলে তার অবচয় ঘটে।

মুনাফা, পুঁজিতান্ত্রিক — উদ্ধৃত-মূল্যের পরিবর্তিত রূপ, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে অতিরিক্ত লাভ।

মুনাফার গড় হার — অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসের প্রভেদ-নির্বিশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান পরিমাণের পুঁজির উপরে সমান মুনাফা।

মুনাফার হার — শতাংশে প্রকাশিত মোট আগাম-দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্ধৃত-মূল্যের অনুপাত। এটি একটি জরুরি সূচক, যা পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির মুনাফাদায়কতা চিহ্নিত করে।

মূল্য — একটি পণ্যে অঙ্গীভূত পণ্য-উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম।

রু'তিয়ে (পরশ্রমজীবী) — 'কুপন-কাটা' পুঁজিপতিরা, পুঁজিপতিদের মধ্যে সবচেয়ে পরগাছা বর্গ, যারা আয় পায় জামানত থেকে এবং ব্যাঙ্ক আমানত করা পুঁজির উপরে সুদ থেকে।

রাজনীতি — বিভিন্ন শ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি রাজনীতি অনুসরণ করে শাসক শ্রেণী কিংবা তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থে।

রাষ্ট্র — অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্যশালী শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার এক হাতিয়ার।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে একটি পর্যায়, যেখানে একচেটিয়া সংস্থাগুলির শক্তি বৃদ্ধি পায় রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে যোগ দেয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, ফিনান্স পুঁজির সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য।

শিল্প-পুঁজি — শিল্প, কৃষি, পরিবহন ও নির্মাণে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পুঁজি কাজ করে।

শেয়ারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ — শেয়ারের যে সংখ্যা তার অধিকারীকে একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দেয়।

শ্রম-নিবিড়তা — সময়ের প্রতি এককে মেহনতি মান্দ্য যে শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

শ্রমশক্তি — মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা — উৎপাদনের একটি একক উৎপাদনে ব্যয়িত সময়ের হিসাবে পরিমাপ করা মনুষ্য শ্রমের কার্যকরতা।

শ্রেণীসমূহ, সামাজিক — জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী; উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং ফলত, তাদের হাতে সামাজিক সম্পদের ভাগ ও কীভাবে তারা সেটা পায় — এই সমস্ত বিষয়ে তাদের পার্থক্য থাকে।

সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট গঠনরূপের প্রথম পর্ব, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা এবং সমাজের সমানাধিকারপূর্ণ সদস্যদের শোষণমুক্ত শ্রমভিত্তিক এক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জনগণের অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থে তা বিকশিত হয় এই নীতি অনুসারে: ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুযায়ী।’

সম্পত্তি-মালিকানা — উৎপাদনের উপায় ও তার সাহায্যে সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্য উপযোজনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

সামন্ততন্ত্র — জমির উপরে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা ও ব্যক্তিগতভাবে পরাধীন ভূমিদাসদের উপরে শোষণভিত্তিক এক শ্রেণীগত-বৈরমূলক গঠনরূপ।

সামরিক-শিল্প সমাহার — একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য শক্তিশালী করা ও মুনফা লাভ করার উদ্দেশ্যে

অনুপ্রতিযোগতার পক্ষপাতী একচেটিয়া অনুসংস্থা, সমর বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এক মৈত্রীজোট।

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ — উৎপাদন প্রণালী ও প্রাধান্যশালী উৎপাদন সম্পর্ক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সমাজের এক ঐতিহাসিক ধরন: তার একটি বনিয়াদ ও একটি উপরিকাঠামো থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়, ক্ষয়িষ্ণু ও মৃদুষ্ণ পুঁজিতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বলগ্ন।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন — যে প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশগর্ভী স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা লাভ করে।

স্টক ও শেয়ার — যে জামানতগর্ভী এটা বোঝায় যে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ একটি জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির পুঁজিতে প্রদান করা হয়েছে, এবং যেগর্ভী তাদের অধিকারীকে সক্ষম করে তোলে কোম্পানির সর্ববিষয়ে অংশগ্রহণ করতে এর মূনাফার একটা অংশ পেতে।

স্থির পুঁজি — উৎপাদনের উপায় ক্রমেয় ব্যবহৃত পুঁজির অংশ। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এর পরিমাণ বদলায় না।



সাম্প্রতিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-কথ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন

মার্ক'সবাদ-লেনিনবাদ

অর্থশাস্ত্র কী

দর্শন কী

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

পুঁজিতন্ত্র কী

সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্ধৃত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

পার্টি কী

রাষ্ট্র কী

বিপ্লব কী

উত্তরণ পর্ব কী

মেহনতি মানদ্বয়ের ক্ষমতা কী

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী